বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর ধারায় মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের আত্মজীবনীমূলক লেখা :

তাত্ত্বিক পরিসর ও 'আত্ম'র বিশ্লেষণ

Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Philosophy, 2019, of the Department of Comparative Literature, Faculty of Arts, Jadavpur University, Kolkata.

দেবস্মিতা সরকার

Class Roll No – 001700203001

Examination Roll No – MPCO194001

Department of Comparative Literature

Jadavpur University, Kolkata

Registration No – 118876 (2012-2013)

Declaration

I, Debasmita Sarkar, hereby declare that the contents of this dissertation, *বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর ধারায় মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের আত্মজীবনীমূলক লেখা: তাত্ত্বিক পরিসর ও 'আত্ম'র বিশ্লেষণ*, have been written by me under the supervision of Professor Parthasarathi Bhaumik. No part of this dissertation has been published anywhere or submitted for any other degree/diploma anywhere/elsewhere.

.....

Signature of the Candidate

Date: .....

Certificate

This is to certify that the following pages contain original research on *বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর ধারায় মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের আত্মজীবনীমূলক লেখা: তাত্ত্বিক পরিসর ও 'আত্ম'র বিশ্লেষণ* by Ms Debasmita Sarkar (Examination Roll No – MPCO194001; Registration No – 118876 of 2012-2013) to be submitted in order to fufil the partial requirement for the award of the degree of Master of Philosophy in Comparative Literature at Jadavpur University, Kolkata. The research has been carried out under my supervision and I recommend it for examination.

I further certify that neither this dissertation nor a part of it has been submitted to any other University for any diploma or degree.

Head Supervisor

Department of Comparative Literature

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মা নীতা সরকারকে। ইনি আমার লেখার প্রথম শ্রোতা। আমি লেখা কিছুটা এগোলেই মা'কে শোনাতাম এবং তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন ও মন্তব্য করতেন। মায়ের পরেই এক্ষেত্রে আমার সহপাঠী রিতি আগারওয়ালার স্থান। আমার বন্ধু ইমন ভট্টাচার্য এই কাজটির জন্য বিভিন্ন বই দিয়ে, আলোচনা করে সাহায্য করেছেন। বইটির ছবিগুলো নিয়ে দেবদত্ত গুপ্ত ও অনির্বাণ নন্দীর সঙ্গে আলোচনা করে অশেষ উপকার পেয়েছি। দেবদত্ত গুপ্ত *রোদে ধান ছায়ায় পান(র‍্যাডের কথা কাগজ)* পত্রিকাটি আমায় দেন। পত্রিকাটিতে দেবদত্ত গুপ্তের সঙ্গে পরিতোষ সেনের একটি সাক্ষাৎকার আছে, যেটি আমার কাজে লেগেছে। অধ্যাপক পার্থসারথি ভৌমিক তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা নেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সাহস জুগিয়ে, বই দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তিনি এই কাজটির নান্দীমুখ ঘটিয়েছিলেন। অতনু সাহা পুরো কাজটির সময় পাশে ছিলেন। প্রয়াত মনীন্দ্র গুপ্তের বাড়িতে উনি জীবিত থাকাকালীন বেশ কয়েকবার গিয়েছি নিজের লেখা কবিতা সঙ্গে করে। খুব উৎসাহ ও মনোযোগ নিয়ে তিনি শুনতেন আর তারপরই সাহিত্য ও ছবির বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা হত। ওনাকে জানিয়েছিলাম যে আমি *অক্ষয় মালবেরি* নিয়ে গবেষণা করতে চাই। কিন্তু কাজটি শুরু করার পর ওনার মৃত্যু ঘটে আর আমি কাজটির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন নিয়ে ওনার মতামত নেওয়া থেকে বঞ্চিত হই। তথাপি মনীন্দ্র গুপ্ত ও ওনার স্ত্রী দেবারতি মিত্রর কাছে আমি ঋণী। যদি আমার গবেষণাটি ডিগ্রি লাভের উপযুক্ত হয়, তবেই এঁদের সবার প্রতি আমার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

প্রথম অধ্যায় 10

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক লেখা : পর্যালোচনা 10

১.১ ধর্ম ও আত্মসন্ধান : রাসসুন্দরী দাসী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী 10

১.২ সমাজচিত্র মুখ্য : শিবনাথ শাস্ত্রী ও দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী 16

১.৩ স্মৃতিমূলক আত্মজীবনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 18

১.৪ প্রাত্যহিকতা ও দিনলিপি : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকথা 27

১.৫ পরিবেশ, বিভিন্ন চরিত্র ও শিল্পীর আত্ম : মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেন 30

দ্বিতীয় অধ্যায় 38

লেখা ও রেখার সৃজন 38

২.১ পরিতোষ সেনের *জিন্দাবাহার*-এ ছবি 40

২.২ মনীন্দ্র গুপ্তের *অক্ষয় মালবেরি*-তে ছবি 50

তৃতীয় অধ্যায় 67

'অথর'-এর রূপান্তর এবং আত্মজীবনীর সীমায়িত প্রেক্ষিত 67

৩.১ পাঠ ও পাঠকের জন্ম-পুনর্জন্ম 67

৩.২ কর্তৃত্বের জটিলতা 76

৩.৩ আত্মজীবনী লেখার ভূমিকায় মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের মতামত 83

চতুর্থ অধ্যায় 90

মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের লেখায় আত্ম ও স্থানিক প্রতিকৃতি 90

৪.১ অক্ষয় মালবেরি 92

৪.২ জিন্দাবাহার 99

উপসংহার 104

গ্রন্থপঞ্জি / Bibliography 107

ভূমিকা

আমার গবেষণার বিষয় হল ‘বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর ধারায় মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের আত্মজীবনীমূলক লেখা : তাত্ত্বিক পরিসর ও ‘আত্ম’র বিশ্লেষণ’। এই কাজটির ক্ষেত্রে মূল অন্বিষ্ট কি কি সেগুলিই এখানে বলব। প্রথমত ১৮৭৬ সাল (১৮৭৬ সালে রাসসুন্দরী দাসীর প্রথম লেখা ছাপা হয় ও তাঁর লেখাটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী) থেকে বাংলা আত্মজীবনীর ধারা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং মনীন্দ্র গুপ্তের অক্ষয় মালবেরি ও পরিতোষ সেনের জিন্দাবাহার টেক্সট দুটিতে এর রূপরেখাটি কীরকম? এই রূপরেখাটির মাধ্যমে একটি পরিবর্তন বা রূপান্তরকে বোঝা যাচ্ছে কিনা? এই অনুসন্ধানটি আমি করেছি প্রথম অধ্যায়ে। বাংলা সাহিত্যে এযাবৎ যত আত্মকথা লিখিত হয়েছে সেই সবগুলিকে আমি আলোচনায় আনিনি। কিন্তু যেসব আত্মজীবনী ও আত্মজীবনীমূলক লেখায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঁকবদল হয়েছে বলে মনে করেছি সেগুলিকেই আলোচনায় এনেছি কয়েকটি ধাপে। প্রথমে বলেছি রাসসুন্দরী দাসী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর কথা, যেই দুটিতে ধর্মের মধ্যে দিয়ে আত্মানুসন্ধান মুখ্য হয়ে ধরা পড়েছে। তারপর এনেছি শিবনাথ শাস্ত্রী ও দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী, যেখানে সমাজ ইতিহাস অনেক বড় করে ধরা পড়েছে ও ব্যক্তির থেকে বড় হয়ে উঠেছে সমাজবোধ – এনাদের লেখার ধরণ ইতিহাসমূলক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যদিকে আত্মজীবনীকে দেখেছেন স্মৃতি নির্ভর হয়ে। তবে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও আত্মপরিচয় এই দুটির ধরণ এক নয়। তাঁর *আত্মপরিচয়* মূলত আত্মদর্শন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তনে তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব যে ছিল তা

স্পষ্ট হয় *আত্মপরিচয়* পাঠ করলে। কিন্তু দুটিতেই তিনি ইতিহাসের ধারণাটিকে বাদ দিয়েছেন। তাঁর দুটি টেক্সটই আলোচনায় আনার কারণ দুটোই আত্মকথা। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে দিনলিপিই আত্মজীবনী আকারে উঠে এসেছে। এই টেক্সটগুলিকে আনার কারণ দুটি। প্রথমত, আগেই বললাম যে বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনীর ধারাটি কীভাবে এগিয়েছে সেটা অনুসন্ধান করা। দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্রথমটির সঙ্গেই জড়িত, তা হল মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের আত্মজীবনীমূলক লেখার অবস্থান বাংলা সাহিত্যের আত্মজীবনীর ধারায় কীভাবে স্থিত এবং কাদের আত্মজীবনীর ধরণ এনাদের লেখায় পড়েছে?

প্রথম অধ্যায়ের পর গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে মনীন্দ্র গুপ্তের *অক্ষয় মালবেরি* ও পরিতোষ সেনের *জিন্দাবাহার* টেক্সট দুটিকেই রেখেছি। এখানেই বলে রাখি মনীন্দ্র গুপ্তের লেখাটি আত্মজীবনী, কিন্তু পরিতোষ সেনের লেখাটিকে পুরোপুরি আত্মজীবনী বলা যায় না। যদিও টেক্সটটি উত্তম পুরুষের স্বরেই কথিত, তথাপি টেক্সটটিতে সমাজদর্শকের দৃষ্টি অনেক বেশি কাজ করেছে। নিজের কথার চেয়ে অন্য সব চরিত্রের জীবনী যেন উঠে এসেছে। এই বিষয়টি আমি প্রথম অধ্যায়ের শেষেই বলেছি। আর এই কারণেই গবেষণার শিরোনামে 'আত্মজীবনীমূলক' শব্দটিই রেখেছি।

দুটি টেক্সটকে একত্রে গবেষণায় রাখার একটা কারণ দুটির বিশেষত্বের সাদৃশ্য। দুটি টেক্সটের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ছবি, যা টেক্সটের অংশ হয়ে উঠেছে। সৃজনশীল লেখার সঙ্গে নিজেদের আঁকা ছবির সমান্তরাল উপস্থাপনা শিল্পের দুটি মাধ্যমকে একত্রিত করেছে। ছবিগুলির (ইলাসট্রেশন) ব্যবহার কতখানি প্রাসঙ্গিক ও ছবিগুলি লেখার সঙ্গে কথোপকথন তৈরি করছে কিনা – এই বিষয়টি আমি আলোচনা করেছি দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

আত্মজীবনীতে ছবি, এক অর্থে বলতে গেলে লিখিত গল্প-কাহিনী কিংবা কাঙ্ক্ষিত বিষয়মালার সঙ্গে তাল ও অনুসঙ্গ মিলিয়ে চিত্র সহযোগে সেই কথা-কাহিনীর একটি চিত্রিত বর্ণনা কিংবা চিত্রায়িত সম্প্রসারণ। এই কর্মের একটি পৃথিবী ব্যাপী ইতিহাস যেমন আছে, ঠিক তেমনি আছে ভারত ভূখণ্ডে চর্চিত এই কর্মের ইতিহাস। আমার গবেষণা সেই ইতিহাসকে সামনে রেখে নয় কিন্তু গবেষণার মধ্যে যেহেতু রচিত লিখনের চিত্ররূপের কথা বলা হয়ে থাকছে সেইহেতু পুঁথিচিত্রের একটি সামান্য তথ্য রাখার প্রয়োজন অনুভব করছি। পাল ও জৈন যুগের পুঁথি চিত্র ধর্মার্থ পূরণকে মাথায় রেখে এবং মুঘল যুগের পুঁথি চিত্র সম্রাটের মহিমার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সবকটিই ছিল শিল্পনির্ভর। পরবর্তীতে এর চেহারা বদল আমরা দেখতে পাই বটতলার কাঠখোদাই, পঞ্জিকা প্রভৃতিতে। এরই একটি উচ্চরূপ তৈরি হয় যখন সাহিত্যে লেখকেরা সাহিত্যের সঙ্গে ছবি যুক্ত করা শুরু করেন। মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের আত্মজীবনী ও আত্মজীবনীমূলক লেখার সঙ্গে ছবির অন্তর্ভুক্তিকরণ বাংলা সাহিত্যে এর মূল্যবান অবদানগুলির একটি দিক।

আত্মজীবনীতে ‘সত্যের দাবী’ একটি বড় ভূমিকা রাখে। এটি অটোবায়োগ্রাফি/ আত্মজীবনী জঁর-টির একটি গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এসেছে প্রথম থেকেই। লেখক যেমন এটি নিয়ে ভাবিত হন, তেমনই পাঠক মানসিকতায়ও এটাই চলে আসে যে লেখাটি সে পাঠ করছে তা লেখকের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। যার ফলে এই জঁর-টির ক্ষেত্রে অথরের কর্তৃত্বের বিষয়টি শেষ অবধি চলেই আসে। উত্তর গঠনবাদে এই নিয়ে রয়েছে তাত্ত্বিক জটিলতা। উত্তর আধুনিকতাবাদের বিতর্কগুলি এবং ‘সত্যের দাবী’ কিভাবে লেখকদের মানসিকতায় কাজ করে থাকে এই বিষয়টি তৃতীয় অধ্যায়ে আছে।

মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের লেখায় পরিবেশ ও প্রকৃতি বিশেষ ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যে কারনে তাঁদের ছোটবেলার স্থান আলাদা মাত্রা পেয়েছে। Peter F. Perreten-এর 'Eco-Autobiography: Portrait of Place/Self-Portrait' ও Melanie Pryor-এর 'Eco-Autobiography: Writing Self through Place' নামক লেখা দুটিতে দুজন লেখকই 'ইকো-অটোবায়োগ্রাফি'/ পরিবেশ প্রধান আত্মজীবনীর ধারণা দিয়েছেন। অক্ষয় মালবেরি ও জিন্দাবাহার'এ প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে আত্মের যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়। এই যোগাযোগ কি কোনোভাবে লেখা দুটিকে ইকো-অটোবায়োগ্রাফি/ পরিবেশ প্রধান আত্মজীবনীর দিকে নিয়ে যায়? এই অনুসন্ধানটি আছে চতুর্থ অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে।

অক্ষয় মালবেরি ও জিন্দাবাহার নিয়ে এর আগে বিদ্যায়তনিক গবেষণা হয়নি। কিন্তু টেক্সটদুটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করা সম্ভব। সেগুলিই আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এই গবেষণায়।

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক লেখা : পর্যালোচনা

কোন একটি আত্মজীবনীতে ব্যক্তির আত্ম, তাঁর জীবনবৃত্তান্ত, তাঁর পরিচিত মানুষজন, স্থান, প্রকৃতি ও সমসাময়িক ইতিহাসের সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। উনিশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী অনেকগুলি ধারায় পাঠকের কাছে এসেছে। বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীগুলি কিরকম ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং কিভাবে জঁর-টির ধারাবদল হয়েছে বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা লেখকের হাতে তার 'diachronic' অনুসন্ধান দেখে নেওয়া দরকার, মনীন্দ্র গুপ্তের 'অক্ষয় মালবেরি' ও পরিতোষ সেনের 'জিন্দাবাহার' নামক আত্মজীবনীর ধারা বুঝে নেওয়ার জন্য।

১.১ ধর্ম ও আত্মসন্ধান : রাসসুন্দরী দাসী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী

১৮৭৬ সালে রাসসুন্দরী দাসীর প্রথম লেখা ছাপা হয় । ৮৮ বছর বয়সে তিনি *আমার জীবন*-এর পূর্ণ আকার দেন। রাসসুন্দরী দাসীর লেখাটিকেই বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মজীবনী বলা হয়। তাঁর নিজের উল্লেখ থেকেই জানা যায় যে ধর্মকে জানার কৌতূহল তাঁর মধ্যে লেখাপড়া শেখার বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। আত্মগত ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে পাঠক হওয়াই ওনার উদ্দেশ্য ছিল। *আমার জীবন* বইতে রাসসুন্দরী দাসীর জীবনের টুকরো টুকরো কথা ও ভাগবত বন্দনা গদ্য ও পদ্যের আকারে বিন্যস্ত হয়েছে। মধ্যযুগীয় ভক্তি সাহিত্য, ব্রত কথা প্রভৃতি ধর্মীয় গ্রন্থের মতো মঙ্গলাচরণ দিয়ে বইয়ের শুরু। আত্মকথার

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যে রাসসুন্দরীর আত্মজীবনীর পূর্ব থেকেই বাংলা সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। তা হয়তো 'আত্মজীবনী' নামক বিশেষ সাহিত্য বর্গ হিসেবে প্রকাশিত হয়নি, বা হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। রাসসুন্দরীর 'আত্মজীবনী' সেইদিক থেকে বিচার করলে কালের ফসল। তৎকালীন সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আত্মজীবনীমূলক লেখাকে স্বাতন্ত্র্যতা দিয়েছিল। মালবিকা কারলেকর তাঁর *Voices from Within: Early Personal Narratives of Bengali Women*-এ বলেন, "Recounting details of events which occurred several decades earlier Rassundari's memoirs are alive with the tensions and anguish she had to silently bear. They also speak of a single-minded determination to overcome the situation. She turned to religion, as a source of comfort from a life of dependence and the worship of Lord Krishna appeared to compensate in part for a life of drudgery and inequality. Religion gave Rassundari a sense of self-worth, an identity. The right to seek her God was not one which could be questioned or curtailed by temporal authorities."[1] কারলেকরের মন্তব্যে ধর্মের কাছে যে সমর্পণের মাধ্যমে আত্মপরিচয় নির্মাণের কথা আছে তা বেশ চিত্তাকর্ষক। ঈশ্বর ও আত্ম'র যুগপৎ বিন্যাস কি পারস্পরিক প্রতিযোগিতার আভাষ ও ক্ষেত্র তৈরি করতে সাহায্য করেছিল? এ প্রশ্নটি বাংলা সাহিত্যের এই প্রাথমিক আত্মজীবনী পাঠের উপজীব্য বিষয় হতে পারে।

বাংলায় লেখা প্রথম আত্মজীবনী বলা হলেও বিস্ময় থেকে যায় যে আত্মজীবনী লেখার ধারণা তিনি কোথা থেকে পেলেন! নিজেকে প্রকাশ করা ও ঈশ্বরের বন্দনা করবার ইচ্ছাই কি তাঁকে এরকম একটি

[1] Malavika Karlekar, *Voices from Within: Early Personal Narratives of Bengali Women* (Oxford University Press, New Delhi, 1991), 117.

রচনা সৃষ্টি করতে বাধ্য করায়? এর উত্তর রাসসুন্দরী দাসীর টেক্সটটি থেকেই পাওয়া যায়। নবম রচনায় এসে রাসসুন্দরী দাসী বলেন, "আমার মন যেমন পুস্তক পড়ার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, তেমনি পুস্তক পড়িয়া পরিতুষ্ট হইয়াছে! ঐ বাটিতে যে কিছু পুস্তক ছিল, ক্রমে ক্রমে আমি সকল পড়িলাম। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত আঠারপর্ব, জৈমিনিভারত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকি-পুরাণ – এই সকল পুস্তক ঐ বাটিতে ছিল।"[2] চরিত সাহিত্যের প্রভাব এই রচনায় রয়েছে। মধ্যযুগের যে অলৌকিক দেবমহিমা, তার প্রভাব 'আমার জীবন'-এ স্পষ্ট। যেমন – ত্রয়োদশ রচনায় 'অন্তরে স্পষ্টদর্শন' অংশে বিপিনবিহারীর ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে দুর্ঘটনা; চতুর্দদশ রচনায় 'প্রকাশ্য ভূত দৃষ্টি'; কিংবা দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় রচনায় বেশর খুঁজে পাওয়া প্রভৃতি বর্ণনাগুলি।

বইটির 'প্রথম রচনা' 'জীবন চরিত', যার প্রথম পাতাতেই রাসসুন্দরী দাসী বলেছেন, "১২১৬ সালে চৈত্র মাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইল। আমি ভারতবর্ষে আসিয়া এত দীর্ঘকাল যাপন করিলাম।"[3] বইটির সম্পাদকীয় অংশে বারিদবরণ ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন, "এখন থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগের এক মহিলা নিজেকে বারবার 'ভারতবাসী' বলে ঘোষণা করছেন – এই দেশপ্রাণতার কোনও তুলনা সেকালে দেখিনি, একালেও কি আমরা ততখানি দেখতে পাই?"[4] কিন্তু দেশ বলতে রাসসুন্দরী দাসীর লেখায় পরিচিতদের কথা এসেছে। *আমার জীবন*-এর পঞ্চম

---

[2] রাসসুন্দরী দাসী, *আমার জীবন* (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৩২), ৫৩.

[3] তদেব, ৫.

[4] তদেব, xxiii.

রচনায় তাঁর উল্লেখ – "আমি এতকাল ঐ দেশে বাস করিতেছি এবং এখনও পর্যন্ত আছি। (ইহার মধ্যে আমার পরিবারের তো কথাই নাই) ঐ দেশের সকল লোক আমার প্রতি অকপট স্নেহ করিয়া থাকেন।"[5] সুতরাং দেশের অর্থ এখানে বড় আকারে 'দেশ' না; রাসসুন্দরীর পরিবার ও পরিচিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ। বারিদবরণ ঘোষের মন্তব্য যে কেন গ্রহণীয় নয় সে সম্পর্কে আরেকটু বলা দরকার। তিনি এখানে 'দেশপ্রাণতা' বলতে জাতীয়তাবাদের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। অথচ রাসসুন্দরী দাসী বারবার উল্লেখ করছেন 'ঐ দেশ' বলে, যা কিনা একটি ছোট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেকারণেই এখানে আত্ম'র সাথে জাতির সম্পর্ক টেনে আনা বিড়ম্বনা মাত্র।

লেখার অনেক জায়গাই confession বা স্বীকারোক্তিমূলক। যেমন – প্রথম ভাগের অষ্টম রচনায় তিনি বলেন, "আমি অতি ছোট ছোট করিয়া পুঁথি পড়িতাম, তথাপি আমার প্রাণ ভয়ে এক একবার চমকে চমকে উঠিত, মনে ভাবিতাম কেহ বুঝি শুনিল। বাস্তবিক ভয়টি আমার প্রধান শত্রু ছিল। সকল বিষয়েই বড় ভয় হইত, আমি ভয়েই মরিতাম।"[6] আশ্চর্যের বিষয় এই ভয়কে তিনি লেখনীর মাধ্যমে জনসমক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন। ত্রয়োদশ রচনার 'মৃত্যু-কল্পনা' অংশের শেষ লাইন, "বাস্তবিক আমি যথার্থ বলিতেছি, আমি যাহা সত্য দেখিয়াছি, তাহাই বলিলাম।"[7] স্বীকারোক্তিগুলি যতখানি ঈশ্বরের কাছে, ঠিক ততখানি পাঠকের কাছেও অকপটে উঠে এসেছে।

---

[5] তদেব, ২৯.

[6] তদেব, ৪৮.

[7] তদেব, ৭৪.

রাসসুন্দরী দাসীর লেখায় প্রকৃতির বর্ণনা প্রায় নেই বললেই চলে। এ প্রসঙ্গে তনিকা সরকার *Words to Win: The Making of Amar Jiban A Modern Autobiography*-তে বলেছেন – "…people, landscape and objects are sparsely drawn and do not come to life, except very rarely. What absorbs the author are her own states of mind, and her own life events are but a trigger to reflection on these. The text wallows in a kind of brooding introspection which, however, revolves round a fixed repertoire : pain, submission, obedience, fear, humility."[8]

ঈশ্বরের প্রতি মানসিক অবলম্বন রাসসুন্দরী দাসীকে সংসার জীবনের নিরাময় প্রদান করেছিল – "আমি অতি বালিকাকালে আমার বুদ্ধি অঙ্কুর হইতে না হইতে আমার মা আমাকে ঐ দয়াময় নামটি বলিয়া দিয়াছেন। সেই দয়াময় নামটি মহামন্ত্র ও মহা ঔষধি বিশল্যকরণী হইয়া আমার অন্তরে অস্থিভেদী হইয়া রহিয়াছে।"[9] একের পর এক সন্তানের জন্ম, অন্তঃপুরের কাজের শারীরিক পরিশ্রম, নারী জন্মের কারণে শিক্ষার থেকে বঞ্চিত হওয়া সবটাকেই তিনি সয়ে নিতে পেরেছিলেন দয়ামাধবকে স্মরণ করে। তবে 'আমার জীবন'-এ রাসসুন্দরীর বর্ণনা থেকে সেসময়কার অন্তরমহলের নারীদের ইতিহাসও ফুটে উঠেছে, সেইসঙ্গে স্রোতের বিপরীতে পড়তে ও লিখতে শেখা এবং (নিজেকে 'পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গী' হিসেবে বারবার উল্লেখ করেও) নিজের জীবনের কথা জনসমক্ষে এনে তিনি স্বাধিকারত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। সরাসরি পুরুষতান্ত্রিকতার বিরোধিতা নেই; কিন্তু এই লেখা সেই সময়ের নিরিখে নারীর অবস্থা বুঝেই পড়তে হবে।

---

[8] Tanika Sarkar, *Words to Win The Making of Amar Jiban: A Modern Autobiography* (Zubaan, 2013), 10.

[9] রাসসুন্দরী দাসী, প্রাগুক্ত, ৮৬.

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) 'আত্মজীবনী'-তেও দেখতে পাই ধর্ম ও আত্ম-অনুসন্ধান মুখ্য হয়ে উঠে এসেছে। এটি বই আকারে প্রকাশিত হয় দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। চতুর্থ পরিচ্ছেদে "এই সৃষ্ট বস্তুসকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্তনশীল ও পরতন্ত্র; ইহাদিগকে যে পূর্ণ জ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন ও চালাইতেছেন, তিনিই নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্তনীয় ও স্বতন্ত্র।"[10] – এটিই মূলমন্ত্রের মতো দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। রামমোহন রায়ের মতো তিনিও পৌত্তলিকতা বিরোধী ছিলেন। অদ্বৈত মতেরও মিল হতে পারেনি তাঁর ব্রাহ্ম ধর্মে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে যদি উপাস্য উপাসক এক হয়ে যায় তবে কে কার উপাসনা করবে! সেকারণে বেদান্ত দর্শনের মতে তিনি মত দিতে পারেননি।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও জীবনে তার অনুশীলন দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় লিখিত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে সংগ্রাম ঘটনাক্রম হয়ে উঠে এসেছে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইতে বলেছেন, "১৮৪৩ সালকেই ব্রাহ্মসমাজের পুনরুত্থানের বৎসর বলিতে হইবে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাকে পুনর্জীবিত করিলেন।"[11] বেদ ও উপনিষদ নিয়ে তাঁর অনুসন্ধান গবেষণার আকারে ধরা পড়েছে আত্মজীবনীতে। বিবাহিত ও আপাতভাবে সংসারী হয়েও তাঁর মন সংসার বহির্ভূত নিরাকার ব্রহ্মে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। তিনি বলেছেন, "না ধনের

---

[10] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯২৭), ৫৩.

[11] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, (নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা, ২০১৬), ১১২.

দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা, কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্বকে ভোগ করা যায়, - তখন আর এই পৃথিবী আমার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহগ্রন্থি সকলি আমার ভাঙ্গিয়া গেল।"[12] দেবেন্দ্রনাথের লেখায় ধর্মই মূলত আত্মকথার অবলম্বন। সে সময় কেন ধর্ম প্রাধান্য পাচ্ছিল? তার কারণ নতুন করে সেসময় বেদ, উপনিষদ ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল। ধর্মের আধুনিকীকরণ হচ্ছিল। জীবনের মধ্যে ধর্মকে অর্জন করার জায়গা চলে এসেছিল। যে কারণে দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি সাহিত্য একইসাথে ধর্মসাহিত্যও হয়ে উঠেছে।

১.২ সমাজচিত্র মুখ্য : শিবনাথ শাস্ত্রী ও দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী

রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিত লিখতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিয়েছেন। পরিচ্ছেদ ভাগে বিভক্ত বইটিতে রামতনু লাহিড়ীর জন্ম, শৈশব, বাল্যদশার সাথে যুক্ত হয়েছে সেসময়কার কৃষ্ণনগরের সামাজিক অবস্থা। বইটির তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'লাহিড়ী মহাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিদ্যারম্ভ, কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ' – এখানে কবি, পাঁচালি, বুলবুলির লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন সমাজের অবস্থা ও তার রীতিনীতি বোঝানোর জন্য; রামমোহন রায়ের ধর্মপ্রচার, সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা; সাহেবদের ভূমিকা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদের শেষে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "তখন ব্রহ্মাপসনা স্থাপন, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন ও সহমরণ নিবারণ, এই তিনটি আলোচনার বিষয় ছিল; এবং স্কুলের বালকগণও এই আলোচনার আবর্ত্তের মধ্যে

[12] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, ২২৩.

আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। এইজন্য এই সকলের বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম। বঙ্গদেশের নবযুগের সূচনাক্ষেত্রে এই আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে, বালক রামতনু কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যারম্ভ করিলেন।"[13] পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম 'প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা' – এই পরিচ্ছেদে সমাজ আন্দোলন, রামমোহন রায়কে সমাজচ্যুত করার ঘটনা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে রামতনু লাহিড়ী সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

ফ্রেডরিক জেমসন The Political Unconscious বইতে বলেছেন জঁর হল "essentially a socio-symbolic message, or in other terms, that form is immanently and intrinsically an ideology in its own right."[14] শিবনাথ শাস্ত্রী এই 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইতে 'তৎকালীন বঙ্গসমাজ'কে অনেক বেশি করে এনেছেন। এইভাবে সমাজকে ও ইতিহাসকে এত বেশি করে আনার ভাবাদর্শ কিকরে এল? 'নেশন'-এর ধারণা তখন তৈরি হচ্ছে। বাঙালির ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টাও সেসময় জোরালো হতে শুরু করে। অশীন দাশগুপ্ত 'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেন "সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত-আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যাই ইতিহাস"[15]। ইতিহাসের এই চেতনার উপস্থাপন দেখতে পাই শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায়। অনেক বেশি তথ্যনিষ্ঠ। ওনার লেখায় ব্যক্তি ইতিহাসের সাথে স্থানের

---

[13] শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, ৪৬.

[14] Fredric Jameson, 'Magical Narratives: On the Dialectic use of Genre Criticism', *The Political Unconscious* (London and New York: Routledge Classics, 2002), 127.

[15] অশীন দাশগুপ্ত, 'ইতিহাস ও সাহিত্য', প্রবন্ধ সমগ্র (আনন্দ, ২০১১), ৩৫.

ইতিহাস, দেশের ইতিহাস সম্পৃক্ত হয়েছে। তিনি বইটিতে অনেকবার দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্ম-জীবনচরিত' থেকে বারবার উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের আত্মজীবনীর প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখতে পাই তিনি লিখেছেন, "এই নবদ্বীপের রাজাদের (অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির) বংশের ইতিবৃত্ত কিঞ্চিৎ মধ্যে মধ্যে বিবৃত না করিলে আমার বংশের সমস্ত অবস্থা জানা যায় না। এ কারণ তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত স্থানে স্থানে নিবেশিত করিতে হইয়াছে।"[16] এই লেখাতেও সমাজ সংস্কার আন্দোলন, বঙ্গের সামাজিক অবস্থার ইতিহাস এসেছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'এ এই একই মডেল পাওয়া যায়। তিনি তাঁর আত্মজীবনীকে সম্পৃক্ত করেছেন ইতিহাসের সাথে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে উনিশ শতকের আত্মজীবনীর একটা ধরণ ছিল – সমাজকে নিয়ে, সংস্কার আন্দোলনকে নিয়ে; অনেক বেশি ঐতিহাসিক ধরণ ছিল। এইসব লেখাগুলিতে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে ইতিহাস বড় হয়ে উঠে এসেছে।

১.৩ স্মৃতিমূলক আত্মজীবনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিশেল ফুকোর 'What is an Author' প্রবন্ধে বলা আছে, "Writing unfolds like a game that inevitably moves beyond its own rules and finally leaves them behind."[17] জঁরের মধ্যে এই

---

[16] দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, *আত্মজীবন চরিত* (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট প্রিঃ ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা, ১৯৫৬), ১.

[17] Michel Foucault, *Language, Counter-memory, Practice : Selected essays and interviews*, (Cornel University Press, 1980), 116.

খেলাটি চলতে থাকে। জঁরের একটি বড় বিশিষ্টই হল নৈরাজ্য বা 'anarchy'। একটি সাহিত্যকীর্তি অন্য সাহিত্যকীর্তিকে ছাড়িয়ে যায়। একটি জঁরের কোন বাঁধাধরা নিয়ম থাকে না। বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস থেকে যেমন আত্মজীবনী লেখার ধরণকে আলাদা করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'জীবনস্মৃতি'র শুরুতে তিনি বলেছেন, "স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।"[18] অবশ্যই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে কারও জীবনের স্মৃতি বোরহেসের 'Funes the Memorious' গল্পের ফিউনসের মতো হবে না; যার কিনা স্মৃতি থেকে কোন কিছুই বাদ যেত না। বরং স্মৃতিকথা একরকম পুনরসংগঠন; যা চলে গেছে তা নতুন করে দেখা, নতুন মানে দেওয়া। 'জীবনস্মৃতি'তে জীবনের স্মৃতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্মৃতির নির্মাণ থাকে। ঘটনাক্রমের সাথে ক্রিয়া ও তাৎক্ষণিক অনুভূতি সময়ের দূরত্বে গিয়ে অন্য পরিণতি বা আকার নেয়। অর্থাৎ যা ঘটে গেল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস নয়, এর নির্মাণ আছে। এর ধরণ পাথুরে প্রমাণ দেওয়া ইতিহাসের মতো নয়। স্মৃতি মানে পুঙ্খানুপুঙ্খ 'সত্য অনুসারী' নয়, স্মৃতির নান্দনিক সৌন্দর্য আছে। সেই নান্দনিক সৌন্দর্যের দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রোম্যান্টিক কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের

---

[18] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* (বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, ১৯৮০), ৯.

লেখায় যেমন স্মৃতি খুব মুখ্য হয়ে উঠে এসেছে। 'Lyrical Ballads'এর preface-এ তিনি বলেন, "I have said that Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquility: the emotion is contemplated till by a species of reaction the tranquility gradually disappears, and an emotion similar to that which was before the subject of contemplation, is gradually produced, and does itself actually exist in the mind. In this mood successful composition generally begins, and in a mood similar to this is carried on; but the emotion, of whatever kind and in whatever degree, from various causes is qualified by various pleasures, so that in describing any passions whatsoever, which are voluntariy described, the mind will upon the whole be in a state of enjoyment."[19] যে কোনো আনন্দ ও আবেগ অনুভূত হলে তার স্মৃতি মনে থেকে যায়। লেখার সময় সেই স্মৃতি সে আবার অনুভব করে/ পুনরায় আস্বাদ করে।

জীবনস্মৃতি-র গঠনটিই হল কিছুটা নিজের কথা, আর তার সাথে পিতৃদেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, লোকেন পালিত প্রভৃতি ব্যক্তিদের সাথে ওনার সম্পর্ক ও পরিচয়ের কথা। কিন্তু পুরোটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে স্মৃতির ওপর নির্ভর করে; যা তাঁর স্মৃতিতে ছিল তাই তিনি লিখেছেন।

'আত্মপরিচয়'-এর শুরুতেও তিনি বলেছেন, "... এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই

---

[19] William Wordsworth and Samuel Colridge, *Lyrical Ballads*, (Routledge, 1991), 251-252.

যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।"[20] এইভাবে জীবনবৃত্তান্ত থেকে বৃত্তান্ত বাদ দেওয়ার কার্যটি রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ করেননি। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর ইতিহাসমূলক লেখনীর ধরণ ও আত্মজীবনীতে তা কিভাবে এসেছে সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি নিজে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কে লিখেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' বইতে মুদ্রিত আছে সেই লেখা। রবীন্দ্রনাথের লেখায় ব্যক্তি বড় হয়ে ধরা পড়েছে সমসাময়িক ইতিহাসের থেকে অনেক বেশি করে। Tynjanov 'On Literary Evolution'[21] প্রবন্ধে বলেছেন যে প্রভাবশালী জঁরের ভেতরে চিরগতিশীল উত্তেজনা কাজ করে যায়। গতিশীল হওয়ার দরুন একটি জঁরের ধরণ ও ইতিহাস পরিবর্তিত হতে থাকে বিভিন্ন লেখকের কাজে। রবীন্দ্রনাথ পাঠকের 'horizon of expectations' নিয়ে যথেষ্টই ভাবিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে শিশির কুমার দাশ 'আত্মজীবনী : জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ' নামক লেখায় মন্তব্য করেছেন, "রবীন্দ্রনাথ জীবন ও বৃত্তান্তের মধ্যে যে দ্বৈততার উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন তা যে তাঁর কাছে যথেষ্ট অস্বস্তিকর ছিল তাতে সন্দেহ নেই।"[22]

---

[20] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মপরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ খণ্ড*, (বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, ২০১৪), ১৩৭.

[21] Jurij Tynjanov, 'On Literary Evolution', in *Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views*, ed. L. Matejka and K. Promorska, (Cambridge, Mass: MIT Press, 1971), 66-78.

[22] শিশির কুমার দাশ, *আত্মজীবনী: জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ*, (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭), ৯.

কাব্যের মধ্য দিয়ে যে জীবনকে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার কথা কিছুটা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়'-এ সৃজনশক্তিকে নাম দিয়েছিলেন 'জীবনদেবতা' – "এই যে কবি যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।"[23] আর বিশ্বপ্রকৃতির সাথে তিনি অনুভব করেছেন এক অবিচ্ছিন্ন যোগ। অনেকটা ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি চেতনার মতো। *The Prelude*-এ যেমন আছে –

"Ah me! that all
The terrors, all the early miseries,
Regrets, vexations, lassitudes, that all
The thoughts and feelings which have been infused
Into my mind, should ever have made up
The calm existence that is mine when I
Am worthy of myself! Praise to the end!
Thanks likewise for the means! But I believe
That nature, oftentimes, when she would frame
A favored Being, from his earliest dawn
Of infancy doth open out the clouds,
As the touch of lightning, seeking him
With gentlest visitation; not the less,

[23] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, ১৩৯.

Though haply aiming at the self-same end,

Does it delight her sometimes to employ

Severer interventions, ministry

More palpable, and so she dealt with me."[24]

বিপুল সংখ্যক রোম্যান্টিক কবিতা মাত্রই স্বতঃস্ফূর্ততার ধারণা – প্রাকৃতিক দৃশ্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তার সাথে *The Prelude*-এ প্রকৃতি একটা সত্তা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের *আত্মচরিত*-এও প্রকৃতি সেরকম একটি আলাদা সত্তা।

উপনিষদের থেকে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন "আমি স্বীকার করি, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি"।"[25] প্রেমকে তিনি আনন্দের অংশ বলেছেন, দুঃখকেও। আনন্দ আবার সুখ থেকে ভিন্ন। সেকথা বোঝাতে 'পাগল' প্রবন্ধে লেখেন যে কাপড় বাঁচিয়ে চলাতে সুখ কিন্তু তা ধূলায় লুণ্ঠিত করাতেই আনন্দ। অর্থাৎ, আনন্দ ও সুখ এক নয়। মনের ভেতর থেকে যা কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাইরে আসে তাই আনন্দ। আনন্দের মধ্যে একটা অতিরেকের ব্যাপার আছে। এটি এমন এক প্রাচুর্য যা মানুষের সব অভাবকে ছাপিয়ে যায়। সমস্তই আনন্দ (ব্রহ্ম), আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। তাহলে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে দুঃখ কি? রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন নিজের মতো করে, নিজের ধারণার মধ্য থেকে। তাঁর মধ্যেও এই প্রশ্ন ছিল; যার সুন্দর সমাধান তিনি

---

[24] William Wordsworth, *The Prelude*, William Wordsworth The Major Works, (Oxford University Press, 1984), 384.

[25] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, ১৬৭.

দিয়েছেন ধর্ম প্রবন্ধে। সেখানে আনন্দকে তিনি এক বৃহত্তর প্রেক্ষিত থেকে দেখেছেন। এই দেখার মধ্যে একখানি স্পর্ধা রয়েছে। জীবনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, লাভ-ক্ষতি, জন্ম-মৃত্যু – অর্থাৎ এককথায় সমগ্রকে নিয়ে। ব্যকরণগত দিক থেকে তুলে আনলে এগুলির প্রত্যেকটাই দ্বন্দ্ব সমাস। আলাদা আলাদা ভাবে অনুরণিত হলেও একই সত্যের অংশ –

"হাসি-কান্না হীরা-পান্না দোলে ভালে

নাচে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে"[26]

ভারতীয় দর্শনের সৌন্দর্য এটাই যে এই দ্বিত্বকে এক করে দেখে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দের রহস্য। আনন্দকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্যই দুঃখের উপস্থিতি; অর্থাৎ দুঃখ আনন্দের অলঙ্কার স্বরূপ।

এরপর ১৯০৮-এ লেখা 'দুঃখ' প্রবন্ধে আনন্দের মধ্যে কবি দুঃখের স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছেন – "তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সেই তাহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে।"[27] অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যেই দুঃখ রয়েছে; দুঃখ, তা আনন্দের অঙ্গ। দুঃখকে বহন করার কারণ আনন্দ। আনন্দের মূল্যই দুঃখ। দুঃখের মূল্যে আমরা সত্যকে চিনি। জীবনে আমরা যত ঘটনা দেখি তার সবই অপূর্ণ, খণ্ড খণ্ড। ছোট ছোট মান অভিমান, ছোট ছোট আশা, ব্যর্থতা, দুঃখ; এইসব অপূর্ণ চিত্রগুচ্ছই জীবন – সেই অপূর্ণতা নিয়েই আনন্দের দিকে অগ্রসরতা।

---

[26] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, (শুভম, কলকাতা, ২০১৩), ৪৫০.

[27] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দুঃখ', রবীন্দ্র রচনাবলী সপ্তম খণ্ড, (বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২), ৪৯৪.

আনন্দের মধ্যে দুঃখের পরেই কর্মের স্থান। দুঃখ যেমন আনন্দের মূল্য, কর্ম তেমনি আনন্দের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কর্ম ধারণার মধ্যে গীতার কর্মপ্রাধান্যর একটা প্রভাব আছে। ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার। দুইভাবে কর্ম হয়ে থাকে – প্রয়োজন থেকে, অভাব থেকে আমরা যেই কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন; আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়, বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি। আনন্দের স্বভাবই হল ক্রিয়া।

আনন্দের আরেকটা দিক ভয়। এর কথাও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। ভয় আনন্দের নিয়ম বা শাসন। ভয়ের মধ্যে একটা ছন্দ আছে। 'ভয়' ও 'আনন্দ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভারতের প্রাচীন ধর্মে বিষ্ণুকে অর্থাৎ স্থিতিকেও মহাছন্দ বা মহাঅনুপ্রাস বলা হত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই একই ধারণা ছিল।

*গীতাঞ্জলি*র ৯ নং কবিতাটি যদি দেখি, সেখানে একটা উদ্দামতা রয়েছে যা দিয়ে 'দুখের তরী' পার করা যায়; আনন্দের উপায় হল দুঃখ। উপনিষদের মধ্যেও এই উদ্দামতার কথা বলা হয়েছে, যা ক্রমাগত পেরোলেই দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের প্রতি উৎসাহ আরও বাড়তে থাকে। উৎসাহ হল বীররসের স্থায়ীভাব। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন যে উপনিষদের মূল বাণী 'অভীঃ', অর্থাৎ ভয় পেয়োনা। রবীন্দ্রনাথও সেই একই সুরে বলেছেন,

"ভয়ের কথা কে বলে আজ-

ভয় আছে সব জানা।"[28]

যদিও বা এই ভয় ছোটো ভয় – আমাদের নিত্যদিনের, নিত্যকর্মের কারণ হিসেবে যে ভয় কাজ করে। তথাপি, উপনিষদের অভিনন্দন স্পষ্ট।

আবার *গীতাঞ্জলি* পর্বেরই ৪২ নং কবিতাটি উপনিষদের প্রভাব স্পষ্ট হয়েও এটি একটি নরনারীর প্রেমের গান। রবীন্দ্রনাথ তো বলেইছেন যে ব্রহ্ম অরূপ কিন্তু এই নিখিল বিশ্ব অর্থাৎ সৃষ্টিতেই তার প্রকাশ। কবি প্রেমকেও দেখেছেন নতুন ভাবে। যিনি প্রয়োজন ছাড়াই আমাদের জন্য সব ত্যাগ করেছেন তিনিই প্রেম – মানে বোঝাই যাচ্ছে তিনিই ব্রহ্ম। কিন্তু এই বোধই অন্য ভাব হয়ে ধরা দিয়েছে *গীতিমাল্য*র ৭ সংখ্যক কবিতায় – "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"[29]; এখানে অপেক্ষাটাই মথিত করে তুলেছে, এখানে প্রেমের চাইতে অপেক্ষাটাই বড়। আর তা যেন মনের মধ্যে এই ভাব এঁকে দেয় যে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষই বড়।

কোনো কোনো জায়গায় বিশ্বচরাচর ও ব্রহ্মের সাথে নিজেকে একাত্ম করতে গিয়ে তিনি ব্রহ্মের আর নিজের স্বভাব ও কর্মের ভেদ অস্বীকার করেন – "তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার/ বাজাই আমি বাঁশি"[30]।

---

[28] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতাঞ্জলি*, রবীন্দ্র রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, (বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, ১৪২১), ১৭.

[29] তদেব, ১১০.

[30] তদেব, ৩৬.

পরমাত্মা সৃষ্টি করেন, সৃষ্টি করার অর্থই বিসর্জন। এই বিসর্জনে কোনো দায় নেই, বাধ্যতা নেই। বিধাতার মতো কবিও একইরকম ভাবে সৃষ্টি করেন; কারণ তিনি শিল্পী।

বোঝাই যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনিষদ চর্চার বিস্তর প্রভাব এসে পড়েছিল। আত্মকথা বলতে গিয়েও তিনি নিয়ে এসেছেন উপনিষদের প্রসঙ্গ (যে কারনে উপরোক্ত বিষয়গুলি আলোচনায় আনা হল)। তবে 'জীবনস্মৃতি' ও 'আত্মচরিত' - এই দুটির গঠন বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ ভিন্ন। একটিতে স্মৃতির প্রাধান্য, অন্যটিতে প্রকৃতি, ব্রহ্মের সাথে আত্ম-র সম্পর্ক।

১.৪ প্রাত্যহিকতা ও দিনলিপি : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকথা

রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় *স্মৃতির রেখা*-য় রূপের জগতে অরূপের বন্দনা করেছেন। টেক্সটির প্রথম লাইন থেকেই তা স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, "কাল রাতে তোমাকে দেখতে পেয়েছি। শেষরাতের কাটা-চাঁদের ও শুকতারার পেছনে তুমি ছিলে।"[31] এই 'তুমি' সম্বোধন যে অনন্তের প্রতি তা কিছুটা অগ্রসর হলেই বোঝা যায়। অনন্ত, যে কিনা সমস্ত পরিবর্তনের, ধংস-সৃষ্টির মধ্যেও অপরিবর্তিত, যুগ থেকে যুগে যার যাত্রা, যে কালের অতীত, জ্ঞানের অতীত, সীমার অতীত। রবীন্দ্রনাথের মতো আনন্দ, সুখ ও দুঃখের ধারণা বিভূতিভূষণের মধ্যেও ছিল। তিনিও উপনিষদের আনন্দের শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন। দুঃখ নিয়ে তিনি বলেছেন, "তরল আনন্দ আধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী নয়। Sadness জীবনের

---

[31] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতির রেখা,* বিভূতিভূষণ রচনাবলী প্রথম খণ্ড, (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮৬), ৩৫৫.

একটা বড় অমূল্য উপকরণ – sadness ভিন্ন জীবনে profundity আসে না – যেমন গাঢ় অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশি হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর আকাশে সত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতিষ্মান হয়ে প্রকাশ পায় – তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়তো তারা চিরকালই অপ্রকাশিত থেকে যেত।"[32] বিভূতিভূষণও জীবনদেবতার উল্লেখ করেছেন তাঁর লেখায়। এছাড়া প্রকৃতিই যেন সুখ, দুঃখ, আনন্দের কারবার ও আশ্রয়। প্রকৃতির বর্ণনা ছেয়ে রয়েছে দিনলিপির সর্বত্র। উদাহরণ হিসেবে কিছুটা তুলে দিচ্ছি – "অন্ধকার সন্ধ্যা। বর্ষার মেঘে আকাশ ছাওয়া। জলার ধারে বনে বড় বড় গাছগুলো অল্প অল্প বার হওয়া তুঁতে রঙের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে সতেজ ঘন সবুজ ঝোপ-ঝাপ, গাছপালায় বর্ষণক্ষান্ত ভাদ্র-সন্ধ্যার মেঘান্ধকার ঘনিয়ে আসছে – এখানে ওখানে জোনাকির দল জ্বলছে, জলের ধারে কচুবনে ব্যাঙ ডাকছে, আকাশে একফালি চাঁদ উঠেছে, চারিদিক নীরব, কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই।"[33] বোঝাই যায় এধরণের বর্ণনা ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় প্রকৃতি কিভাবে লব্ধ। মনীন্দ্র গুপ্ত 'বিভূতিভূষণের দিনলিপির শুরু' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, "ফিকশন লিখিয়েরা বিশেষ জোর দেন গল্পাংশের ওপর। জলবায়ু, ভূখণ্ড, নিসর্গ কথাকারদের কাছে গৌণ। বিভূতিভূষণ কিন্তু এই ব্যাপারে ব্যতিক্রম। তাঁর বইয়ে মানুষ যতটা অপরিহার্য বনপাহাড়, গাছপালা,

---

[32] তদেব, ৩৬২.

[33] তদেব, ৩৬০.

আলোছায়াও ততটাই। সৃষ্টিতে হাওয়া জল গাছ লতাই তো আগে এসেছে- ওদের কোনো ভাষা নেই, ওরা নৈঃশব্দ্যের জাল ছড়িয়ে কথা বলে।”[34]

বিভূতিভূষণ বলেছেন যে সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব। যে যেই সময় জন্ম নেয়, সে সেই সময়কার একটি স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু আবারও এই ইতিহাস বোধের সাথে রামতনু লাহিড়ী কিংবা কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের আত্মজীবনীতে ইতিহাসের প্রাধান্যের পার্থক্য আছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের আত্মজীবনীমূলক লেখা প্রায় একই রেখায় স্থিত। শুধু পার্থক্য এখানেই যে *স্মৃতির রেখা* গোটাটাই দিনলিপির আকারে তারিখ দিয়ে লিখিত। লেখকের প্রাত্যহিকতা জড়িয়ে রয়েছে এর মধ্যে। ২৭ শে অক্টোবর, ১৯২৪ থেকে ২৬ শে এপ্রিল, ১৯২৮ পর্যন্ত সময়ে মাঝে মাঝে দিনলিপি লিখেছেন তিনি। মজাটা এখানেই যে ফর্মটা দিনলিপি হলেও সেটাই আত্মজীবনী হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের *তৃণাঙ্কুর, বনে পাহাড়ে, হে অরণ্য কথা কও* প্রভৃতি লেখাতেও প্রাত্যহিকতা বা দিনলিপি আত্মজীবনীর আকারে উঠে এসেছে। এই লেখাগুলির দ্বারা বাংলা আত্মজীবনী লেখার ঘরানায় একটি নতুন প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে। তাছাড়া আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা প্রভৃতির যে উপবিভাজনগুলি করা হয়ে থাকে তার সূক্ষ্ম ব্যবধানগুলিও আবছা হয়ে পড়েছে।

---

[34] মনীন্দ্র গুপ্ত, ‘বিভূতিভূষণের দিনলিপির শুরু’, *মনীন্দ্র গুপ্ত গদ্যসংগ্রহ ২*, (অবভাস, ২০১৬), ৬৬.

১.৫ পরিবেশ, বিভিন্ন চরিত্র ও শিল্পীর আত্ম : মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেন

মনীন্দ্র গুপ্তের *অক্ষয় মালবেরি* ও পরিতোষ সেনের *জিন্দাবাহার* এই দুটি আত্মজীবনীতে ফর্মের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি*-র ধরণটার ছায়া আছে। রবীন্দ্রনাথ *জীবনস্মৃতিতে* যে ফর্মটির সূচনা করেন সেটি আরও উন্নততর পর্যায়ে দেখতে পাই *অক্ষয় মালবেরি* ও *জিন্দাবাহার* টেক্সট দুটিতে। মনীন্দ্র গুপ্ত 'আত্মজীবনী' নামক প্রবন্ধে আত্মজীবনীকারদের মধ্যে প্রভেদ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিজেই বলেছেন, "আরও একদল সুবিধাপ্রাপ্ত আত্মজীবনীকার আছেন : উচ্চপদাধিকারী সরকারি চাকুরে। এঁদের হাতে অনেক ক্ষমতা, রাজনীতিকদের অনেক দাবার চাল, অনেক বাজিমাতের সাক্ষী এঁরা। এঁরা সেই ক্ষমতা এবং গুপ্ত চক্রান্তের বিবরণ দেন। এসব লেখার কিন্তু একটা অন্য মূল্য আছে – এঁরা ইতিহাসের উপাদান যোগায়।" এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে মনীন্দ্র গুপ্তের আত্মজীবনী প্রথাগত ইতিহাসের উপাদান যোগানোর থেকে আলাদা।

দুটো বইয়ের মধ্যেই শিশুর অন্বেষণের মোড দেখতে পাই। জাঁক লাঁকা শিশুর 'mirror stage' নিয়ে বলেছেন, "This act, far from exhausting itself, as in the case of monkey, once the image has been mastered and found empty, immediately rebounds in the case of the child in a series of gestures in which he experiences in play the relation between the movements assumed in the image and the reflected environment, and between this virtual complex and the reality it reduplicates – the child's own body, and the persons and the

things, around him."[35] *অক্ষয় মালবেরির* প্রথমে দেখতে পাই 'মা', 'ঠাকুমা ও তাঁর বন্ধুরা', 'ছোটমা', 'বাস্তু', 'আমাদের ভাঁড়ার', 'ধান চাল মাছ', 'এজমালি বাড়ি ও জ্ঞাতিবর্গ' এসব অংশ পার করে এসেছে 'আমার খেলা' অংশ। অর্থাৎ চারপাশের পরিবেশ, প্রকৃতি, মানুষজন, মানুষজনের পৃথক পৃথক আচার ব্যবহার, কথা ও ভাব প্রকাশের ধরণ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন লেখক। 'আত্মজীবনী লেখার সংকট' প্রবন্ধে মনীন্দ্র গুপ্ত বলেন যে তিনি যে একজন অতি সাধারণ লোক একথা মাথায় রেখে নিজের বদলে পারিপার্শ্ব, সময়, লোকজন অর্থাৎ স্থান কাল পাত্র যেমনটি দেখেছিলেন তেমনি বর্ণনা করার দিকে জোর দিয়েছিলেন। সুতরাং "এটি আত্মজীবনীও বটে, সময়ের জীবনীও বটে।" *জিন্দাবাহার*-এও শুরুতে 'দর্জি হাফিজ মিঞা', 'সিন্ পেন্টার জিতেন গোঁসাই', 'ডেন্টিস্ট আখ্তার মিঞা', 'প্রসন্নকুমার' প্রভৃতি মানুষজনের ধরণ/ আচরণ গল্পের মাধ্যমে বর্ণনার পর 'আমি' বলে অংশটিতে লেখকের বর্ণনার সাথে পাঠক এসে পৌঁছায়। সুতরাং দুটো টেক্সটেই শুরুতে নিজের কথার বদলে বিভিন্ন পরিচিত ও তাদের পরিবেশ বর্ণিত; যাদের মধ্যে থেকে এই দুই টেক্সটের লেখকেরা বড় হয়ে উঠেছে এবং চারিপাশের মধ্যে তাঁদের 'আত্ম'-র গঠনটি হয়ে উঠেছে।

অক্ষয় মালবেরি-র তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বকে মনীন্দ্র গুপ্ত নিজেই বলেছেন যে প্রধানত পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন, দ্বিতীয়ত ও গৌণত নিজের জীবন। এই প্রথম পর্বে বিভূতিভূষণের *তৃণাঙ্কুর, স্মৃতির রেখা* প্রভৃতি টেক্সটের মতো প্রকৃতি এসেছে খুব বড় করে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার গল্পে, "ডাক্তারী ছুরির বদলে

[35] Jacques Lacan, 'The mirror stage as formative of the function of the I as revealed in psychoanalytic experience', http://www.davidbardschwarz.com/pdf/mirror.pdf , (accessed February 10, 2019).

আমাদের পশ্চিমপুকুরপারের নির্জন বাঁশঝাড় থেকে কেটে আনা কাঁচা বাঁশের চোঁচ দিয়ে আমার নাড়ী কাটা হয়েছিল, একথা জেনে নিজেকে খুব অন্যরকম লাগে। কাঁচা বাঁশের চোঁচ ব্লেডের চেয়েও ধারালো, তাতে টিটেনাসের বীজ না থাকলেও বনের সবুজ বিষ ছিল।"[36] 'বনের সবুজ বিষ ছিল' কথাটি ইঙ্গিতবাহী, যা প্রথম পর্বের বর্ণনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে ধরা পড়েছে। 'বাস্তু' অংশে মনীন্দ্র গুপ্ত বর্ণনা করেছেন, "এজমালি বিশাল উঠোনটার পশ্চিম দিকে আমাদের ভিটে। মাটির ভিত, বাঁশের খুঁটি, কাঠের পাটাতন, টিনের চাল। আস্ত আস্ত ত্রিশিরা হোগলাপাতা, চাঁছা চেরা বাঁশ ও বেতের বাধন দিয়ে তৈরি হালকা বেড়া। উপরে আদ্যিকালের অক্ষয় করুগেটেড শীট আর নিচে স্থাবর মাটির ভিতটি ছাড়া সমস্ত বাড়িটাই পলকা। খুঁটির পাকা বাঁশগুলো মানুষের হাত লেগে চিক্কণ এবং রক্তাভ হলদে। পাকা হোগলাপাতার বেড়া নরম এবং সোনালি- বাইরে কড়া রোদ থাকলে হোগলাপাতার ফাঁপা শরীর ভেদ করে ঘরের মধ্যে আভা আসে। রাত্রে, বনের অন্ধকারে রেড ইণ্ডিয়ান ঢিপিতে রান্নার আগুন জ্বললে বাইরে থেকে তাকে আলোভরা ফানুসের মতো দেখায়, দিনের বেলা তেমনি আমাদের ঘরের ভিতরটা। - বাড়িটা যেন দিনের মণ্ডলের মধ্যে আছে। বেড়ার সমান্তরাল ঠাসা হোগলাপাতায় যদি কোথাও কোনো সূক্ষ্ম ফাঁক থাকত সেখান দিয়ে সূর্যের কিরণ ঢুকত তীক্ষ্ণ ব্লেডের পাতের মতো। হঠাৎ সেই কিরণের মধ্যে দেখতাম সাত রঙের কণার বিচ্ছুরণ।"[37] তিনি একা একা খালপাড়ে, অথবা উঁচু ঢিবির উপর বিশাল শিরীষ গাছের তলায় যেখানে কেউ যায় না, সেইসব জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে চলে যেতেন 'রেইন ট্রি' গাছের নীচে। এই পরিবেশ ও

---

[36] মনীন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয় মালবেরি, (অবভাস, ২০১১), ১১.

[37] তদেব, ২০.

প্রকৃতির চেতনা ফিরে এসেছে ‘একখণ্ড জমি, একটি দুপুর ও আমার শৈশব’ কবিতায়। একইরকম পরিবেশের বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন – “ওই বাঁশঝাড়তলে, ওই তারাবন নিয়ে কোলে, আমার শৈশব/ বন্দী হয়ে শুয়ে থাকে, খেলে, ঘোরে।”[38] এই প্রথম পর্বে মনীন্দ্র গুপ্তের শৈশবের কথা নিবন্ধিত। তিনি জন্মেছিলেন এক গ্রামীণ পরিবেশে। শিশু মনীন্দ্র গুপ্তের প্রথম জীবন কেটেছে বরিশালের গৈলা গ্রামে এবং পরে আসমের শিলচর শহরে। শৈশবে তিনি *বর্ণপরিচয়, আদর্শলিপি, বোধোদয়, হাসিরাশি* প্রভৃতি বই পড়ার সাথে সাথে *ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, অর্ধকালী, মেজো বউ, রাজা হাম্বীর, শিশুরঞ্জন রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, সাবিত্রী সত্যবান, হিতোপদেশ, কবিতা কৌস্তভ* বইগুলি পড়তেন। এর মধ্যে অর্ধকালী বইটি ওনার সবচেয়ে ভালো লাগত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

জন্মেই দশ মাস বয়সের মাথায় মায়ের সাথে বিচ্ছেদের ঘটনা ছোটবেলায় তাঁকে এক অজানা দুঃখের মুখে ফেলত বারবার করে। ভাঙা সবুজ বোতলের টুকরো হয়ে কোথায় মাটির নীচে সেই দুঃখ লুকিয়ে রয়েছে তার খোঁজ করতেন তিনি। এই নিয়ে মৌপোকাদের গ্রাম কাব্যগ্রন্থের ‘প্রথম জাতক, প্রথম যাতনা’ কবিতাতে লিখেছেন –

“ভিতরে ভিতরে জানি, আমি সেই প্রথম জাতক।

একা একা লাল রুক্ষ ঢেউ তোলা প্রান্তরপৃথিবী আর জনশূন্য আকাশের নিচে

বিস্মিত ঘুরেছি। রৌদ্রপায়ী গাছের মতো দেহ, ফল্গুলতার ধমনী

প্রতিদিন আনন্দে জেগেছে,

---

[38] মনীন্দ্র গুপ্ত, কবিতা সংগ্রহ, (আদম, ২০১৬), ২৫.

প্রতিরাত্রে বিষণ্ণ হয়েছে অকারণে

... আমি প্রথম জাতক

সেই থেকে ভোগ করি এ জন্মের প্রথম যাতনা।"[39]

মনীন্দ্র গুপ্ত নিজেই উল্লেখ করেছেন যে বই ও ছবিতে যেখানে প্রকৃতি ও অতিপ্রকৃতির কথা থাকত সেসব জায়গা ওনাকে বেশি আকৃষ্ট করত। বই আর প্রকৃতি এই দুই ছোটবেলা থেকে তাঁর সঙ্গী হয়ে উঠেছিল এবং এর ফলস্বরূপ জীবনের অন্যান্য দুঃখ তাঁর কাছে ছোট মনে হত।

দ্বিতীয় পর্বে তার বয়ঃসন্ধি ও শিক্ষার কথা রয়েছে। এই পর্বে ইংরেজ শাসিত দেশের গ্লানি, বন্যা, সমাজে বিভিন্ন পেশার মানুষ (যেমন- শিববাড়ির সাধু, স্বামী পুরুষাত্মানন্দ, কৃষ্ণসাধু, গৌরদাস বাবাজী, বৈষ্ণবীদিদি, মায়াপুরের বৈষ্ণব, সাধু দিদি, ম্যাজিশিয়ান), রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণের লেখা পাঠ, নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখদের ছবির সাথে পরিচয় প্রভৃতি কথা আছে। 'বই আর ছবি' অংশে মনীন্দ্র গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে ছোটবেলাতেই প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বিচিত্রা ছাড়াও অন্য পত্রিকার কিছু পুরনো সেট পড়েছিলেন। এছাড়াও সেসময়ে যে সমস্ত লেখকদের বই পাওয়া যেত, যেমন – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রবোধকুমার সান্যাল এরা সেসময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন এবং এদের লেখা তিনি পড়তেন। 'বই আর ছবি' ও 'বয়ঃসন্ধি' অংশে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ আছে তিনি কাদের লেখা পড়তেন ও অল্প বয়সে কাদের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যা পরবর্তী সময়ে তাঁকে লেখায় ও তার সঙ্গে ছবি আঁকায় অনুপ্রাণিত করেছিল। অক্ষয়

---

[39] তদেব, ৪৮-৫৯.

মালবেরির পাতায় পাতায় লেখার সাথে যুক্ত রয়েছে ছবি। তাঁর নুড়ি বাঁদর উপন্যাসেও দেখতে পাই লেখার সাথে ছবির অন্তর্ভুক্তিকরণ।

সাধু সন্ন্যাসীদের জীবনের প্রভাব যে মনীন্দ্র গুপ্তের ওপর পড়েছিল তা ওনার 'মহিম্ন স্তোত্র', 'ঈশ্বর', 'মহামায়া', 'শিব-ত্রিকালেশ্বরের কাছে', 'সন্ন্যাসী', 'শ্মশানে ভোজ', 'পিশাচ', 'প্রেতযোনি' প্রভৃতি কবিতা পড়লে স্পষ্টই টের পাওয়া যায়। তাঁর শিল্পী জীবনের প্রস্তুতিপর্ব ছোটবেলাতেই হয়ে ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি স্টুডেন্টস ফেডারেশন নামে সংগঠনে তিনি যোগদান করতে চাননি, কারণ তিনি যেকোনো রকম দলীয় প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। বিচ্ছিন্ন মানুষ নিজের হালকা ওজন নিজেই বয়ে বেড়াবে এমনটাই ছিল ওনার মত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর যে তাঁর ভবিষ্যৎ খড়কুটোর মতো অনিশ্চিত স্রোতে ভাসবে তা তিনি অবগত ছিলেন। তাই বিনা বাক্যব্যায়ে ফিরে এলেন নিজের জন্ম ভিটেয়। এখানেই দ্বিতীয় পর্ব শেষ।

তৃতীয় পর্বে চাকরি জীবন এবং মূলত ভারতীয় সৈন্য বিভাগে যোগদান ও সেখানকার জীবনের গল্প। পরিবারের কেউ পড়াশুনো নিয়ে উচ্চবাচ্য না কয়ায় তিনি নিজেই জীবিকার সন্ধান শুরু করেন। ২০০১ সালে বসে ১৯৪১ এর কলকাতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কলকাতায় এখনকার জনসংখ্যার ভিড়ে আতঙ্কিত হবার কথা জানিয়েছেন। তাঁর অমিয়মামার অফিসে একটি চাকরি জুটে যায় ৩০ টাকা মাইনের। কিন্তু জলবসন্ত হওয়ায় অনুপস্থিতির কারণে হাতছাড়া হয়ে যায় সেই চাকরি। পরে তিনি যুদ্ধ বিভাগে সৈন্যের কাজে ঢোকেন। যুদ্ধ যে মানুষের সামনে অনেক কাজের সুযোগ এনে দিয়েছিল তার উল্লেখ তিনি করেছেন।

সবমিলিয়ে *অক্ষয় মালবেরি*-তে মনীন্দ্র গুপ্তের শৈশব, বয়ঃসন্ধি ও প্রথম যৌবনের কথা আমরা জানতে পারি। *জিন্দাবাহার*-এ এরকম কোন পর্ব বিভাজন নেই। ধারাবাহিক ভাবে শিরোনাম সহযোগে বর্ণনা এগিয়েছে। ভূমিকা অংশে পরিতোষ সেন বলেছেন, "ছবি আঁকাই আমার অনেক দিনের পেশা; লেখা নয়। ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে পোট্রেট, এমন-কি একই চিত্রপটে একটা গোটা পরিবারের প্রতিকৃতি আঁকায় আমি ববাবরই বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তাই মনে হল শব্দ দিয়ে প্রতিকৃতি রচনা করলে কেমন হয়! এই বইটি সেই প্রয়াসেরই ফল।"[40] বাস্তবিকই বইটি এগিয়েছে শব্দ দিয়ে বিভিন্ন চরিত্রের প্রতিকৃতি তৈরি হয়ে। চরিত্রগুলির বর্ণনায় ধরা পড়েছে বিভিন্ন রকম অসঙ্গতি, অনেকটা সুকুমার রায়ের চরিত্রগুলির মতো। সেগুলিকে শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখেছেন পরিতোষ সেন। চরিত্রগুলি থেকে তিনি পেয়েছেন শিল্পের রসদ। গল্পের আকারে তাদের সাথে পরিচিতির কথা উঠে এসেছে আত্মজীবনীতে। আগেই উল্লেখ করেছি *অক্ষয় মালবেরি* ও *জিন্দাবাহার* দুটোতেই চরিত্র গুলো অনুসরণ করতে করতে লেখকেরা 'আমিত্বে' এসে পৌঁছচ্ছে, ব্যক্তিত্বের ধারণা তৈরি হয়েছে। এই 'আমি' শিল্পীর আমিত্ব। আশেপাশের থেকে কিভাবে শিল্পী সত্তায় আসছে সেটাই পড়তে পড়তে আবিষ্কার করে পাঠক। তবে পরিতোষ সেনের আত্মকথার ক্ষেত্রে একজন সমাজদর্শকের চোখ অনেক বেশি করে উপস্থিত। শার্ল বোদলেয়ার তাঁর 'The Painter of Modern Life' প্রবন্ধে যে 'Flaneur'-এর বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তা লক্ষ্য করা যায় *জিন্দাবাহার* নামক আত্মজীবনীতে অনেক বেশি করে। লেখক যেন একা একা বিচরণ করেন, কোনো কিছুর সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা নেই। বেশিরভাগটাই নিরপেক্ষ বা বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখা। মনীন্দ্র গুপ্তের আত্মজীবনীর সমস্তটা

---

[40] পরিতোষ সেন, *জিন্দাবাহার*, (প্যাপিরাস, ১৩৮৬), ৯.

সেরকম নয়। যেমন – 'ছোট ভাই' অংশটিতে ভাইকে নিয়ে পরিবারে সৃষ্টি হওয়া অশান্তি দেখে নিজে বাবার ওপর রাগ করে ভাইকে নিয়ে বাড়ির বাইরে চলে আসেন শিশু মনীন্দ্র গুপ্ত। এরকম সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া *জিন্দাবাহার*-এ প্রায় নেই বললেই চলে। বরং তার জায়গায় বিভিন্ন ব্যক্তির প্রায় জীবনী আকারে লিখন উঠে এসেছে টেক্সটটিতে। ঢাকার নবাববাড়ির ঠিক পুব, পশ্চিম ও উত্তরের এলাকা কটি ছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র। পরিতোষ সেন বলেছেন যে উত্তর থেকে দক্ষিনমুখী অনেকগুলো সরু পথ এই কেন্দ্রে এসে মিলিত হয়েছে এবং এটাই শহরের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য এলাকা। তাঁর মতে, যেমন বিচিত্র সেখানকার বাসিন্দারা তেমনই বিচিত্র সেসব গলিঘুচির নাম। এরই মধ্যে একটি জিন্দাবাহার লেন, যেখানে ওনার জন্ম। *জিন্দাবাহার*এ পরিতোষ সেন যাদের কথা লিখেছে তারা প্রত্যেকেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র। এই যে জীবনীর আকারে লেখার ধরণ – এর জন্য টেক্সটটির অনেক অংশকেই Heterobiography[41]-র নিদর্শনও বলা যেতে পারে।

পরিবেশ ও বিভিন্ন চরিত্র – আমি – শিল্পী আমি। মূলত এই তিনটি পর্যায়ে টেক্সট দুটির যাত্রা। পাঠক এগুলি থেকে vicarious pleasure (দূর থেকে যে আনন্দ পাওয়া) পেয়ে থাকে। সম্পৃক্ত হওয়া ও আগন্তুক হওয়া – এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া টেক্সটগুলি পাঠের সাথে সাথে চলতে থাকে। পরিতোষ সেনের *রং তুলির বাইরে* বইয়ের রচনাগুলিও উত্তম পুরুষে রচিত। কিন্তু আমি এই গবেষণায় জিন্দাবাহার নিয়েই আলোচনা করব। লেখার সাথে যে ছবিগুলি যুক্ত আছে সেগুলি নিয়ে পরের অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা থাকবে।

---

[41] Heterobiography অর্থাৎ অপর ব্যক্তির দ্বারা লিখিত জীবনী, যা আত্মজীবনীর বিপরীত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লেখা ও রেখার সৃজন

গৌতম ভদ্র *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার* বইতে বলেন, "বইয়ের পাতার প্রদর্শনে রেখাগুলির দেখনাই তো লেখার রূপেই লীন। গ্রন্থচিত্রে চোখের ঘুরুনিতে দেখা ও পড়ার দোহারকির নিহিতরূপ প্রকাশিত হয়..."[42]। ইলাসট্রেশনের উদ্দেশ্য হল লেখাকে চিত্রিত সত্যে পরিণত করা। নিদেনপক্ষে লেখার একটা চাক্ষিক রূপ তৈরি করা। এটা করতে গিয়ে কাহিনীর অনেক না বলা দিকও প্রস্ফুটিত হয়। মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেন লেখক ও শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে ইলাসট্রেশনের আনন্দ উপভোগ করেছেন।

ফটোগ্রাফি বাস্তবের হুবহু চেহারা তুলে ধরে। তাই তাতে ইলাসট্রেশনের আনন্দ পাওয়া যায় না। অশোক মিত্র তাঁর *ছবি কাকে বলে*[43] বইতে বলেন যে চোখে যেরকম দেখছি তার যথাযথ প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা ছবির কাজ নয়। পাথুরে প্রমাণ দিয়ে বিষয়বস্তুর নিখুঁত, হুবহু প্রতিচ্ছবি অথবা নথি প্রমাণ হিসেবে সার্থকতা কিংবা অসার্থকতা ছবির আসল মূল্য নয়। কারণ নিছক অনুকরণে বিষয় বা বস্তুর আসল সত্তা কিংবা তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সামনে আসে না। আর নথি প্রমাণ মানে তো তার ব্যবহারিক মূল্যই প্রধান। বাইরের গুণাগুণ এবং লক্ষণ ক্যামেরা ধরতে পারে কিন্তু বাহ্য রূপের অন্তরে কি আছে তার সন্ধান ক্যামেরা থেকে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ছবির কাছে আমরা বাহ্য রূপের গভীরে কি আছে সেটাই

---

[42] গৌতম ভদ্র, *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার*, (ছাতিম বুকস, ২০১১), ৩৫০.

[43] অশোক মিত্র, *ছবি কাকে বলে*, (আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১), ১৩-১৪.

প্রত্যাশা করে থাকি। এমনটাই ছিল অশোক মিত্রের বক্তব্য। বস্তুতই চিত্রশিল্পীরা বাস্তবের হুবহু অনুকরণ করেন না। কোনো ক্ষেত্রে অনুকরণ হলেও তার মধ্যে থেকে যায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা বাইরে থেকে দেখা সত্যের থেকে অনেক বেশি প্রকট। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তাঁর 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction'[44] প্রবন্ধে চিত্রশিল্পী ও ফটোগ্রাফার নিয়ে একটি মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। জাদুকর ও শল্যচিকিৎসকের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন যথাক্রমে চিত্রকর ও ক্যামেরাম্যানকে। চিত্রশিল্পীকে তিনি বলেছেন জাদুকর, যে কিনা বাস্তবের থেকে একরকমের স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রাখেন। আর ক্যামেরাম্যান গভীরভাবে বাস্তব চিত্রেরই মধ্যে ঢোকেন। যদিও বা তিনি বলেছেন বাস্তবের উপস্থাপনায় ক্যামেরার গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে চিত্রশিল্পীর ক্ষেত্রে উপলব্ধিটা অনেক বেশি। মনের খাতিরে কোনো কিছুকে ধরে রাখা, অবচেতনে তুলে রাখা চিত্রের ক্ষেত্রে প্রবলভাবে সামনে আসে। এটাই একটা বড় কারণ লেখার সঙ্গে ইলাসট্রেশনের দিকে ঝোঁকার। লেখক, আর্টিস্ট, ক্যামেরাম্যান সকলেই বাস্তবের পুনর্গঠন করেন। কিন্তু পার্থক্য এটাই যে লেখক ও আর্টিস্ট-এর এই বাস্তবের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় কল্পনার আধিক্য অনেক বেশি থাকে। এটাই পার্থক্য একজন ক্যামেরাম্যানের সাথে লেখক ও চিত্রশিল্পীর। আর যখন লেখা ও ছবির রেখা একসাথে এসে মেলে তখন তা হয়ে যায় ইলাসট্রেশন। যা পাঠকের মনকেও কল্পনার জগতে দ্বিগুণ উস্কে দেয়।

---

[44] Walter Benjamin, 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction', (New York: Schocken Books, 1969), 13.

২১. পরিতোষ সেনের *জিন্দাবাহার*-এ ছবি

আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা গেল যে পরিতোষ সেন নিজেই বলেছেন শব্দ দিয়ে প্রতিকৃতি তৈরি করলে কেমন হয় এবং তাঁর এই টেক্সটটি সেই চেষ্টারই ফলাফল। এক্ষেত্রে লেখার উদ্দেশ্য চিত্রশিল্পের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। শিল্পীর আত্মোপলব্ধি লেখা ও ছবির সঙ্গে কতটা কথোপকথন তৈরি করেছে তা এই অংশে দেখে নেব।

জিন্দাবাহার-এর শুরুতেই একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে মেয়ের ছবি। ছবির নীচে লেখা আছে মেয়েটি অন্দর মহলের চিক সরিয়ে রং বেরঙের প্রজাপতি চালে ঘরে ঢুকল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ক্যালিগ্রাফিক রেখার ধরণে মেয়েটির শরীরের প্রতিটি খাঁজ স্পষ্ট। পায়ের জুতো ও মাথার ওড়না দেখে বোঝা যায় যে সে একটি মুসলিম বাড়ির মেয়ে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা তার মধ্যেকার অগভীরতা ও চটুলতাকে নির্দেশ করছে। তার পায়ের নীচের গালচে ও পেছনের খিলানের গঠন প্রমাণ করছে যে সে অত্যন্ত বড়লোক বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের রেকাবীতে ধরা তিনটে সরবতের গ্লাস এবং আলগা চপলতা বলে দিচ্ছে মেয়েটি উচ্চ ভৃত্য স্থানীয় কেউ। নাকের নাকছাবি ও কানের দুল বুঝিয়ে দিচ্ছে তার ব্যসনপ্রিয়তা। তার মরাল গ্রীবায় তাকানোর ধরণ চপলতাকে বাড়াচ্ছে। মাথায় ব্রহ্মচূড় খোপা। ঠোঁটের ঠিক ওপরে ও নাকের পাশে একটি তিল দেখা যাচ্ছে। লেখায় এই ছবিটির উল্লেখ আছে বইয়ের ৬১ পাতায়; যেখানে বর্ণনার সঙ্গে প্রথমে অবস্থিত এই ছবিটি হুবহু ফুটে উঠেছে। আসলেই দৃশ্যটি নবাব বাড়ির।

দ্বিতীয় ছবিটি দর্জি হাফিজ মিঞার। যদি এটা বলে নাও দেওয়া থাকত তাও দর্শক প্রথমেই অনুধাবন করবে যে ইনি একজন মুসলমান দর্জি। কারণ তাঁর পরনে চেক লুঙ্গি। তাঁর torso/ দেহকাণ্ড অশ্বমুখাকৃতি। লোকটির দুরবস্থার যে লিখিত বিবরণ তার সাথে ছবির রৈখিক বিবরণ মিলে যায়। তাঁর

একটি পেটের রোগ আছে – জীর্ণ শীর্ণ শরীর, কণ্ঠার হাড় বেরোনো, পাঁজরার হাড় বেরোনো, পেট ঢুকে গেছে। পরিতোষ সেন এহেন হাফিজ মিঞার সঙ্গে অস্থিচর্মসার বুদ্ধের তুলনা করেছেন। লোকটির হাত ও পা অস্থিচর্মসার, হনু ভাঙা – এটি দর্শায় যে ইনি অত্যন্ত অসংযত ও অসংলগ্ন জীবন যাপন করেন এবং তাঁর খাদ্যাভ্যাস খুবই খারাপ। মুখে বয়সোচিত গাম্ভীর্য এবং তার সঙ্গে অত্যন্ত উচ্চ একাগ্রতা বুঝিয়ে দেয় লোকটি নিজের কাজে ভীষণই পারঙ্গম। শিল্পীর খুঁটিনাটির দিকে নজর এতোটাই যে লোকটি হাতে যে কাপড়টি ধরে আছে ও তাতে যে চিহ্নগুলি প্রদান করা আছে, সেটি পাঞ্জাবীর মাপে সুনিপুণ ভাবে দেখানো। লোকটির মুসলমান হওয়ার আরেকটি প্রধান সূত্র হল তাঁর পাশের পিকদানিটা। তখনকার দিনে পিকদানি মুসলমান ঘরেই থাকত। আর এটি এও প্রমাণ করে যে লোকটি তাম্বুল বিলাসী। পাশে রাখা বিড়ির বান্ডিল ও দেশলাই বাক্স এবং সামনে রাখা ছোট্ট চায়ের কাপ বলে দেয় যে লোকটি অত্যন্ত ধূমপায়ী ও চা বিলাসী। আশেপাশে যত্র তত্র ছড়িয়ে রাখা চ্যাপ্টা চকের টুকরো, কাঁচি ইত্যাদি বলে দেয় লোকটির অগোছালো স্বভাবের কথা। পাশে দেয়ালে টাঙানো নতুন পুরনো জামাকাপড়ের বিন্যাস লোকটির একরোখা এবং উগ্র স্বভাবের পরিচায়ক। কারণ কিছু ছোটো নতুন পিরান পাঞ্জাবীর ওপরে রাখা ধূলো ময়লা লাগা নিজের পাঞ্জাবিখানি। একপাশে আলস্যে রেখে দেওয়া হাতপাখা বুঝিয়ে দেয় লোকটির কাজে নিমগ্নতার কথা, যে অত্যাধিক গরমও তাঁর মনসংযোগে বাধা সৃষ্টি করে না। বোঝাই যায় ছবিটি বাস্তব থেকে হুবহু অনুপ্রাণিত। কঠোর বাস্তবকে চিহ্নিত করে একটি একাকী লোকের জীবনশৈলীকে তুলে ধরা হয়েছে।

পরের ছবিটি সিন পেন্টার জিতেন গোঁসাইয়ের। লোকটির পোশাক ও দাঁড়ানোর দৃপ্ত ভঙ্গী বলে দিচ্ছে যে তিনি দৃঢ়চেত এবং প্রবল বাস্তববাদী। বাস্তববাদী কারণ লোকটি ধুতির ওপরে একটি গামছা

পড়ে – যা বোঝায় যে ধুতিটিকে অবাঞ্ছিত কারণে নোংরা হওয়ার হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। লোকটির চোখে মুখে যে নিমগ্নতা এবং তার সাথে তাঁর ক্যানভাসের যে পরিধি তা বলে দেয় তিনি একজন অতি উঁচুদরের চিত্রশিল্পী – যিনি নিজের কাজ নিয়ে নিজের সম্পর্কে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। শিল্পীসুলভ আচরণ গোটা ছবিটি জুড়ে। অসাবধানে রেখে দেওয়া ব্রাশ ও তুলির গুচ্ছ, চটজলদি কাজ করার জন্য বিভিন্ন পরিমাপে বানিয়ে রাখা রঙের বাটি, সেই বাটিতে রাখা আলগা একটি বা দুটি তুলি এটা বুঝিয়ে দেয় যে লোকটি নিজের কাজে ব্যবহৃত রঙের প্রয়োগ এবং উজ্জ্বলতা সম্পর্কে ভীষণ যথাযথ। ক্যানভাসের পেছনে রাখা কাঁচের বোতলের সারি বুঝতে সাহায্য করে লোকটির সুরাপ্রিয়তার কথা। সেই সারির মাঝে রাখা একটি মাত্র কুঁজো ও তার মুখে উল্টানো একটি গ্লাস লোকটির একাকী এবং কুমার জীবনের পরিচায়ক। এই ক্ষেত্রে এটি পরিতোষ সেনের শিল্পী হওয়ার খেলা। তিনি কুঁজো ও গ্লাসটি নাও দেখাতে পারতেন। কারণ ছবিটি তো তিনি দেখে আঁকেননি, মানসকল্পে এঁকেছেন – কম্পোজিশনটা নিজের। সেক্ষেত্রে তাঁর কুমার জীবন বোঝানোর জন্য অনেক বোতলের মাঝে কুঁজোটি রাখা হচ্ছে অদ্ভুত ভাবে – যা একাকীত্বের প্রতীক। কুমার জীবনের প্রতীক উল্টানো কাঁচের গ্লাসটি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে এনার স্ত্রী নেই, এমনকি কোনো চাকরও নেই যে সরিয়ে রাখবে গ্লাসটি। নিজে খেয়ে নিজেই উল্টিয়ে রাখছেন। এখানেই পরিতোষ সেনের শিল্পী চাতুর্য। মাথার ওপরে দুটো বাল্বের জায়গায় একটাও থাকতে পারত। কিন্তু দুটো বাল্ব প্রয়োজন বড় ক্যানভাস পেনটিং করতে। অর্থাৎ এও বোঝা যায় যে লোকটির হাতে কাজ আসে ও লোকটি খুবই ব্যস্ত। সবশেষে বলা যাক ক্যানভাসের ছবিটির কথা। ক্যানভাসে আছে দুটো গরু, একটা গাছ ও চাঁদ। দিন হলে সূর্যের আলো বোঝাতে রঙের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে বোঝাতে হত। আলাদা করে গোলাকৃতি থাকত না।

অতয়েব এটি চাঁদ এবং লোকটি রাতের দৃশ্য আঁকছেন। গরু, গাছ ও চাঁদের কম্পোজিশন বলছে উনি কোনো একটি ঘটনা বা গল্পের পুনরুৎপাদন করছেন। সুতরাং বর্ণনা না পড়েও আমরা বলতেই পারি যে ইনি একজন সিন পেন্টার হতেই পারেন।

চতুর্থ ইলাসট্রেশনটি ডেন্টিস্ট আখতার মিঞার। আগের তিনটি ইলাসট্রেশনে যেমন তিনটি চরিত্রের বৈষয়িক অবস্থান বোঝা যাচ্ছিল। এই ছবিটি দেখে ধরতে পারা যাচ্ছে না যে ইনি ডেন্টিস্ট। যেটা পাচ্ছি তা হল শারীরিকভাবে অত্যন্ত সবল এবং কর্মতৎপর একজন মানুষের রৈখিক উপস্থাপনা। সবল কারণ শিল্পীর রেখায় ধরা পড়ে লোকটির পেশীবহুল গর্দান এবং চওড়া কাধ। তার সঙ্গে লোকটির প্রকাণ্ড মুখ যা লোকটির অত্যন্ত শক্তসমর্থ হাড়ের গঠনকে নির্ধারণ করে। এই ধরণের হাড়ের গঠনযুক্ত একটি লোক প্রকৃতিগত ভাবে অত্যন্ত সবল ও পুরুষালী। সেটি লেখায় তাঁর কর্মতৎপরতার বর্ণনার পরিপূরক। পরনে যে শার্টটি তার ধরণ খুব নির্দিষ্ট – কারণ শার্টে দুটি বোতাম যুক্ত ঢাকনা দেওয়া বুকপকেট, তার সঙ্গে কাঁধের ওপর দুটো বোতাম যুক্ত চওড়া স্ট্র্যাপ আছে যা শুধুমাত্র কোনোরকম বাহিনী অন্তর্ভুক্ত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষার্থীর পক্ষেই পরা সম্ভব। এই নির্দেশগুলি লোকটির সেনাবাহিনীতে থাকার সম্ভবনাকে প্রতীত করে। শার্টের বোতামের ফাঁকে বেরিয়ে থাকা ঘন রোমরাজি এবং লম্বা কানে অগোছালো কেশ বোঝায় লোকটি অকৃতদার, অতয়েব একাকী। মাথার চুল শিল্পীর বর্ণনায় হয় খুবই পাতলা নয়তো উঠে গেছে এবং দুই ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ছোটো করে ছাঁটা। যা আবার লোকটির সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্তির পরিচায়ক, যা থেকে আমরা ধারণা করতেই পারি লোকটির একটি নিয়মনিষ্ঠ ও বাঁধাধরা জীবনের কথা।

পঞ্চম ছবিটি প্রসন্নকুমারের। শুরুতেই ছবিটি পরিশীলিত, মার্জিতরুচি, বনেদি, বড়লোক বাঙালীর ছবি। ডানহাতে ধরা আলবোলা বা গড়গড়ার নলটি বুঝিয়ে দেয় লোকটির ধূম্র বিলাসিতার কথা। কারণ আমাদের বাঙালী সমাজ নিয়ে লেখা যা কিছু আছে তাতে এই ধরণের আলবোলা বা গড়গড়ার সাথে অম্বুরি তামাকটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এই অম্বুরি তামাক ছিল তখনকার দিনের একটি বেশ দামী এবং কিয়ৎ দুর্লভ ধূম্র ব্যাসন। বনেদিআনার ছাপ লোকটির চুনোট করা ধুতি, তার গলার উত্তরীয় এবং তার বসার মেহগনি বা সেগুন কাঠে তৈরি পাশ্চাত্য অনুকরণীয় কেদারাটি বহন করছে। মুখের স্বভাব গাম্ভীর্য, চুলের মাঝখানে সিঁথি করা ছাট এবং যত্নলালিত গোঁফ বলে দেয় লোকটি সমাজে অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী। সেক্ষেত্রে আমরা ধারণা করতেই পারি লোকটি তখনকার দিনের একজন প্রথিতযশা ডাক্তার কিংবা উকিল। লেখকের লেখনী আমাদের জানায় তিনি ছিলেন প্রসন্নকুমার সেন, লেখকের পিতৃদেব এবং তদনীন্তন বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত সুনামসম্পন্ন এবং অতি বিচক্ষণ কবিরাজ।

এর পরের ইলাসট্রেশনটি ‘আমি’ অংশের সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে যেটা দেখতে পাই তা হল আয়নার মধ্যে ছবিটি। ছবিটি একটি চলন্ত যাত্রাপালা বা নাটকের প্রহসন। যেন যিনি দেখছেন যেখানে পালা চলছে আয়নাটি তাঁর পাশে রাখা। অনুপম কারুকাজ করা একটি মন্দির গোত্রীয় ফ্রেম। এই বিশেষ ফ্রেমটি ব্রিটিশ শাসনকালে মুসলিম কারিগররা ব্রিটিশ তত্ত্বাবধানে করত। একটি বিশেষ ফ্রেমিং-এর ধরণকে বলা হয় ব্রিটিশ ফ্রেমিং – যা একটি বিশেষ ব্রিটিশ টেকনিককে মেনে চলে। সেখানে ফ্রেমের চারপাশে কল্কা বা লতাপাতার প্রচুর কারুকার্য করা থাকে এবং ফ্রেমটি শুধুমাত্র একটি কাঠকে খোদাই করে তৈরি করা হয়, যা পরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ভাস্কর্য দ্বারা আনিত হয়। সেই বিশেষ আঙ্গিককে অনুসরণ করে ভারতে মুসলিম

কাঠখোদাই শিল্পীরা ভারতে বিভিন্ন মন্দির গাত্রে খোদিত ভাস্কর্যের রকমফের অনুকরণে এরকম ফ্রেমিং করা শুরু করে। এই ফ্রেমিং-টির গায়েও সেই বিশেষ ধরণটি লক্ষিত হয়। এখানে ফ্রেমের ছোট ছোট কারুকাজে নজর দিলেই এক নজরে মন্দির গাত্রে খোদিত ভাস্কর্যের হালকা আভাষ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত রাবণ বধ পুরো পরিধির সামনে রয়েছে। রাবণ রাজা বাঁ হাতে তলোয়ার ধরে আছেন। খুব সাধারণভাবে এটি প্রতিফলনের ফলাফল। একইরকমভাবে রাম ও লক্ষ্মণের বাঁ হাতে তীর ও ডান হাতে ধনুক স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রতিফলনের ফলাফল। অতয়েব এখান থেকে একটি ধারণা করা যেতেই পারে যে রঙ্গমঞ্চটি কোনো বড়লোকের বাড়ির উঠোন বা দালান যার এক পাশে এই কারুকার্যময় আয়নাটি দেয়ালে টাঙানো ছিল। আয়নার ফ্রেমের কার্য থেকে এই আয়নার মহার্ঘতা অনুমেয়। অতয়েব এটি যে অতীব বড়লোক বাড়ির দালানে সেটি নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

শাঁখ কেটে শাঁখা ছবিটিতে আমরা দেখতে পাই চিরাচরিত শাঁখ থেকে শাঁখা তৈরির একটি পদ্ধতি। ছবিতে যিনি কাজ করছেন তাঁর চোখে মুখের ভাবভঙ্গীর সাহায্যে বোঝা যাচ্ছে সে যে কাজটি করে চলেছে সেই কাজটি সে যথেষ্ট পছন্দ করছে। কারণ তাঁর চোখে মুখে হালকা প্রশান্তির ছাপ। সেইসঙ্গে বহুদিনের শাঁখ থেকে শাঁখা তৈরির অভ্যাসের ফলে তাঁর শরীরের গঠনের সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। একটু মন দিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে কাঁধের ও হাতের পেশীর গঠনের পরিবর্তন। শীর্ণ হাত অথচ পেশীবহুল এবং রোগা কাঁধ অথচ কাঁধের পেশী অত্যন্ত শক্ত, অনেকটা চাইনিজ মার্শাল আর্টিস্টদের মতো। এর প্রধান কারণ হাতে জোড়ে জোড়ে ঘষে ঘষে শাঁখ ফালি করে শাঁখা বানানোর নিরন্তর প্রক্রিয়া।

'আগুন' অংশের সঙ্গে সংযুক্ত প্রথম ছবিটিতে আগুনের একটি রুদ্র বীভৎস রূপকে মনুষ্যাকৃতি দেয়ার প্রয়াস করা হয়েছে। লেখকের লেখনী অনুযায়ী সেই আগুনের অগুন্তি চোখ, অগুন্তি জিভ। সেই বিষয়টি ধরা পড়েছে এই প্রতিকৃতিটির কপালের কিছু চোখের বিন্যাসে এবং তার ঠোঁটের নীচে একাধিক জিভের ড্রয়িং-এ। মনুষ্য মূর্তি কল্পনা করা সত্ত্বেও এক আদিম আগ্রাসী জান্তব রৈখিক বিবরণ এখানে কিছুক্ষেত্রে দেখা যায়। আফ্রিকার কিছু আদিম মুখোশ, প্রাচ্যের বিশেষত চৈনিক শিল্পরীতির এবং দক্ষিণ ভারতীয় কথাকলি নৃত্যশৈলীর সাজসজ্জার রেফারেন্স দেখতে পাওয়া যায়, যা এই ছবির বীভৎস রসকে আরও বর্ধিত করে। আমাদের বাংলার প্রাচীন ডাকাতদের যে বর্ণনা আমরা পাই বিভিন্ন লেখায় সেই বর্ণনার উল্লেখে আমরা এই ছবিটির মধ্যে একটি সর্বগ্রাসী লুণ্ঠন মনস্ক ভাব দেখতে পাই।

বেন শান অঙ্কিত ফায়ার বিস্ট ছবিটির অনুকরণে করা 'আগুন' অংশের দ্বিতীয় কাজটির মধ্যে সত্যি সত্যিই একটি কল্পিত, জান্তব ধারণা প্রকাশ পায়। এখানে অদ্ভুত একটি জন্তুর কল্পনা করা হয়েছে। যেটি কোনো একটি পাখি এবং কোনো একটি বা দুটি স্তন্যপায়ীর এক অদ্ভুত একীকরণ, যেখানে জন্তুটির মুখের গঠন একদিক থেকে দেখলে সিংহের মতো, আরেক দিক থেকে দেখলে ঘোড়ার মতো। তার সঙ্গে সঙ্গে আছে জন্তুটির পায়ের ভয়ঙ্কর দর্শন নখ। যা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে এই জন্তুটি খুবই আগ্রাসী এবং এটি মাংসাশী। এই কাজটির মধ্যে ইলাসট্রেশনের চেয়েও পেন্টিং-এর ধারণা পরিলক্ষিত হয়। লেখক নিজে চিত্রশিল্পী হিসেবে কিউবিজম ও ফবিজম এই দুটি ধারণার চর্চা করেছেন। তাঁর সেই চর্চাকালের একটি অস্পষ্ট ধারণা এই কাজটির মধ্যে বিদ্যমান।

'ন'বাবু, সেজোবাবু' অংশে প্রথমের ছবিটি একটি মেয়ের যে পৌষের দুপুরবেলা ছাদে বসে নানা রঙের সুতোয় রুমালে নকসা তুলছিল। লেখকের বর্ণনা থেকে জানতে পারি যে তাতে লেখা ছিল 'ভালবাসাই পরম সুখ' বাক্যটি। বারবনিতাদের পাড়ায় লাল ইটের তেতলা একটি পুরনো বাড়ির ছাদের থেকে ন'বাবু এবং তাঁর সঙ্গে লেখকও মেয়েটিকে দেখেছিলেন। লেখক বলেন মেয়েটির হাসিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই মুগ্ধতার ছবি তিনি এঁকেছেন বড় হয়ে। ছবিতে সেই ক্যালিগ্রাফিক ধরণ। রুমালে প্রজাপতিটি বুঝিয়ে দেয় যে মেয়েটি অবিবাহিত। সে জীবনসঙ্গী খুঁজছে। প্রথমত সময়টি অবসরের। অবসরকে সৃজনশীল করে তুলছে মেয়েটি। অবসরকে এভাবে সৃজনশীল করে তোলা বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যেই ছিল। এই ছবিটি *চারুলতা* চলচ্চিত্রের প্রথম দৃশ্য যেখানে চারুলতা সেলাই করছিল, সেটির কথা মনে করিয়ে দেয়। তার মাথায় ব্রহ্মচূড় খোপা। দ্বিতীয়ত এটি একটি উকি দর্শনের ফলাফল। লেখক ও তাঁর ন'বাবু এক্ষেত্রে 'peeping tom', যারা লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটিকে দেখে নিচ্ছে এবং মেয়েটি সেটা জানেনা। তৃতীয়ত মেয়েটি একাকী, এই সময় আর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া ছবিটির মধ্যে আছে একটি তাৎক্ষণিকতা।

এই অংশে পরের ছবিটির কথায় আসা যাক। এটিও পরিতোষ সেনের চোখ থেকে আঁকা। এখানে মেয়েটির শারীরিক পুঙ্খানুপুঙ্খ দেওয়া সত্ত্বেও মনের মধ্যে কোনও বিকার জন্ম দেয় না। ছবিটিতে একদল মেয়ে হেঁটে চলেছে। মজার ঘটনা প্রায় বারো তেরো জন মেয়ের মধ্যে শুধুমাত্র একটি মেয়েকে আঁকার প্রতিই কৃপাদৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। তাই এইকথা সহজেই অনুমেয় যে এই মেয়েটি শিল্পীর স্মৃতিতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। একটু ভাল করে দেখলেই দেখা যাবে প্রত্যেকটি মেয়েরই

কোমরে একটি করে কলসি, যা থেকে অনুমান করা যায় তারা দলবদ্ধভাবে জল নিয়ে ফিরছে। এই বিশেষ মেয়েটির শাড়িটি অত্যন্ত ভেজা অবস্থায় দেখানো হয়েছে। যার ফলে তার কটিদেশ এবং বক্ষ সৌন্দর্য আমাদের চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্ণনা না পড়লেও আমাদের একটি ধারণা জন্মাতেই পারে যে এই মেয়েটি ও তার সঙ্গীরা সকলেই বণিতা শ্রেণীর। কারণ তখনকার সময় অনুযায়ী একমাত্র এই শ্রেণীর নারীরাই নিজেদের সৌন্দর্য জনসমক্ষে প্রকাশে পিছপা হত না। একইসঙ্গে এই মেয়েটির সরল মুখের গড়ন ও সারল্যে ভরা চোখ তার সাথে নাকে পড়ে থাকা দুটি মুক্তাযুক্ত নাকছাবি এটি বর্ণনা করে যে মেয়েটি বণিতা শ্রেণীর হলেও কুমারী। এছাড়া তার পাশের যে মেয়েটি, তার মদির চক্ষু বর্ণনা করে প্রায় সমবয়সী হলেও সেই মেয়েটি তাদের শ্রেণীর মধ্যে আলোচ্য মেয়েটির তুলনায় আগেই বণিতা বৃত্তিতে পা দিয়েছে। আলোচ্য মেয়েটির রমণীয় ও কমনীয় এই দুটি রূপেরই একসাথে প্রকাশ পাবার হেতু আমরা ধরে নিতেই পারি শিল্পীর অল্পবয়সের মুগ্ধতার ফল এটি।

'হে অর্জুন' অংশের সাথে যুক্ত ছবিটি একটি অর্জুন গাছের। প্রায় হুবহু দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে লেখায়। সাধারণত বেশিরভাগ গাছই অপ্রতিসম হয়, কিন্তু এই গাছটি আশ্চর্যজনক ভাবে প্রতিসম এবং অনুপাতের দিক থেকে একেবারেই সঠিক। গাছের ডালপালার বিস্তৃতি এবং তার জটীলতা বোঝাতে গাছের পাতার আধিক্য ঘটানো হয়নি বরং ডালপালাগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটু ভালো করে ছবিটি দেখলে বোঝা যায় যে গাছের গায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাপের ফোকর বা কোটর বিদ্যমান। তার সাথে গাছের প্রধান গড়নটি বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা জন্মায় যে গাছটি খুবই পুরনো এবং তা অদ্ভুতভাবে ঝড় প্রতিরোধী।

এই অংশের পরের ছবিটিতে স্পীড স্কেচিং-এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। ছবির রেখাতেই স্পষ্ট যে এটি একটি শালিক পাখির ছবি। খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে শালিক পাখিটি একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে একটি ধারণা করা যেতেই পারে যে পাখিটির একটি পা কোনো কারণে জখম হয়েছে। পাখিটির সামনের বাটি দুটির একটিতে কিছু ছোট পোকা এবং আরেকটি বাটিতে কিছু খাবার দেওয়া আছে।

'জামিলার মা' অংশে ছবিটিতে আঁকা মানুষটির অভাব অনটন চোখে পড়ে। কারণ ছবিটিতে শাড়ির নীচে আর কিছু নেই ঊর্ধ্বাংশে। যদিও সে সময়ের সমাজ অনুযায়ী শাড়ি পড়ার প্রথা এরকমই ছিল। তাও তাঁর বুকের বেরিয়ে থাকা পাঁজর, কণ্ঠার হাড়, হাত পায়েরও অত্যন্ত সরু গঠন এবং মুখের মধ্যে সবকিছু না পাওয়ার বিতৃষ্ণা অত্যন্ত প্রকট। ছবিটিতে মহিলা বাটনা তৈরি করছেন। আমরা মহিলাটিকে সমাজের পরিচারিকা শ্রেণীর একজন লোক হিসেবে ভাবতেই পারি।

পরিতোষ সেনের আত্মজীবনীতে স্থান পাওয়া সবগুলি ছবিই এখানে আলোচিত হল। এখানে লেখকের বর্ণনা ছাড়াও ছবিগুলি দেখে কি বোঝা যায়, সেটাই বোঝার চেষ্টা করেছি মূলত। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে উনি সারাজীবন ধরে পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলনের (রিয়ালিজমের পাশাপাশি কিউবিজম, ফবিজম, এক্সপ্রেশনিজম) চর্চা করেছেন, তাহলে আত্মজীবনীতে সংযুক্ত প্রায় সবকটি ইলাসট্রেশন ('আগুন' অংশের ছবি দুটি বাদে) তিনি কেন বাস্তবধর্মী করেই আঁকলেন? এগুলি কি তিনি ইচ্ছাপূর্বক একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সেখানকার মানুষজনের কাজ ও আচরণ বোঝানোর জন্যই করেছেন? নাকি কোনও বৃহত্তর তাৎপর্যও থাকতে পারে? প্রথমত ইলাসট্রেশনগুলি রাখার কারণ হতে পারে বিষয়কে শব্দের কৌশলের

বাইরে বেরিয়ে উপস্থাপন করার ইচ্ছা - সে নাহয় বোঝা গেল। এক্ষেত্রে কি তিনি নিজের বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার ধরণটিকেই বেছে নিয়েছেন যাতে সেগুলি সর্বজনগ্রাহ্য হয়? সেকারণেই ড্রয়িং মোডেরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পরিষ্কার ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ড্রয়িং ভিত্তিক কাজগুলো। ইলাসট্রেশন বলেই কাজের এই ধরণ, এটাও হতে পারে। কারণ পেন্টিং ও ইলাসট্রেশন দুটোই আঁকার ধরণ কিন্তু তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা আছে। যদি সেই সীমারেখা অতিক্রম করে যাওয়া হয় তাহলে একটি পেন্টিং ইলাসট্রেশন হয়ে যেতে পারে ও একটি ইলাসট্রেশন পেন্টিং হয়ে যেতে পারে। এখানে পরিতোষ সেনের কাজে খুব সুচারু ও সংযত ভাবেই সেই সীমারেখা অতিক্রম করা হয়নি। ইলাসট্রেশনের ধারা অনুযায়ী ড্রয়িং ফরম্যাটেই রাখা হয়েছে। এই কাজগুলি বাস্তবঘেঁষা কারণ আত্মজীবনীর ধরণ হিসেবে বাস্তবকেই দেখানো হয়েছে। *জিন্দাবাহার* এর ছবিগুলি আমরা দেখতে পাই কিন্তু সেগুলিতে গোপনসূত্র সেভাবে দেখা যায় না। তথাপি রেখা এবং লেখার বর্ণনায় কথোপকথন তৈরি হয়, যদিওবা তা খুব সহজেই অনুমেয় এবং বাহ্যিক।

২.২ মনীন্দ্র গুপ্তের *অক্ষয় মালবেরি*-তে ছবি

মনীন্দ্র গুপ্ত যে ছোটবেলা থেকেই বইয়ের সাথে সংযুক্ত ছবি, পঞ্জিকার ছবি প্রভৃতি দেখে মুগ্ধ হতেন তার পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন ‘বইয়ের ছবি’ নামক প্রবন্ধে। তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম পর্বে প্রচ্ছদ বাদে ১১ টি ইলাসট্রেশন, দ্বিতীয় পর্বে ১০ টি ও তৃতীয় পর্বে ৯ টি ইলাসট্রেশন রয়েছে। ইলাসট্রেশনগুলি বাস্তবের চেয়ে অনেক বেশি করে কল্পনাকেন্দ্রিক। লেখা ও ছবি মিলে দেখা জগত ও অদেখা জগত একসাথে ঠাঁই

পেয়েছে। তিনি টেক্সটের মধ্যেই ইলাসট্রেশন সুবিন্যস্ত করতেন। ছোটো কোনো বাক্য বা শব্দই ইলাসট্রেশন হয়ে আছে গল্পের চাক্ষুষ সম্প্রসার হয়ে। ইলাসট্রেশনের জন্য তিনি সাদা-কালোকেই বেছে নিয়েছেন।

প্রথমেই চলে আসা যাক প্রচ্ছদের ছবিটির কথায়। প্রচ্ছদের ছবিটি একটি জঙ্গলের তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু মধ্যে একটি শূন্যস্থান। যেন সেখান দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করা যায়। শূন্যতাকে চিত্রিত করা হয়েছে এমন ভাবে যেন তা একটি চিররহস্য। জঙ্গল থেকে তাঁর দাদু, বড়মা, কখনো তিনি নিজে সংগ্রহ করতেন খাদ্যের উপযোগী সামগ্রী। বনের ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় কোথায় ঢেঁকির শাক জন্মেছে, কচি ডুমুর কবে খাওয়ার মতো ডাঁশা হল ইত্যাদি তাঁর বড়মার চোখ এড়াত না। তিনি বলেছেন যে বনবাগানের সাথে তাঁর দাদুর অন্তরঙ্গতা ছিল আরও গভীর। তাঁর দাদু চিনতেন সমস্ত ভেষজ লতাগুল্ম। একবার এক দুর্দিনে দাদু দুপুরের পর খন্তা হাতে বেরিয়ে বনের এক দুর্গম জায়গা থেকে মন দেড়েক ওজনের এক বিশালাকার মেটে আলু নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছিলেন। শিশু মনীন্দ্র গুপ্ত ছিল সেই অভিযানে দাদুর সঙ্গী। অভিযানটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন ‘রোমাঞ্চকর’ হিসেবে। সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি তুলনা করেন আদিম জগতে প্রাচীন শিকারীর সঙ্গে বালক যেদিন প্রথম শিকারে যায় তার যেরকম লাগে সেরকম আস্বাদের সাথে। ঘটনাটি ভীষণভাবে দাগ কেটেছিল বলেই বয়সকালে তিনি সেটির সুনিপুণ বর্ণনা দিতে পেরেছেন। গভীর বন-জঙ্গলের যে রোমাঞ্চ, যে রহস্য তাই তিনি এঁকে দিয়েছেন প্রচ্ছদে। আত্মজীবনীর প্রচ্ছদে এরকম ছবি রাখার কারণ কি হতে পারে? গভীর বন-জঙ্গলের মতো জীবনও রহস্য দিয়ে ঘেরা – সেটারই ইঙ্গিতবাহী কি ছবিটি?

পরের ছবিটির গঠনমূলক সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথের ডুডুলস'এর সাথে পাওয়া যায়। কিন্তু এর ড্রয়িং-টা ভালো। মালবেরি বুস গানটাকে ঘিরে গাছের ড্রয়িং-টা করা হয়েছে। শুরুর লাইনটি করা হয়েছে মালবেরি বুসের ড্রয়িং দিয়ে, যা গানের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। গঠনমূলক ব্যাখ্যা করলে এটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খাতায় করা আঁকিবুঁকির সামান্য মিল পাওয়া যায়। প্রক্রিয়াগত ভাবে এটি ড্রয়িং'এর আওতায় পড়ে। এটি একটি পরিপূর্ণ ইলাসট্রেশন যা সত্যি সত্যিই লেখার গুরুত্বকে বর্ধিত করে। কারণ এক্ষেত্রে গানটি যদি শুধু লেখা থাকত তাহলে গানে বারবার উচ্চারিত একই কথা হয়তো পাঠক বা দর্শকমহলে অতটা অনুসন্ধিৎসা তৈরি করত না। অথচ এই মালবেরি গাছের ড্রয়িং-টি এখানে করায় এই লেখার চলনে একটি টুইস্ট তৈরি হয়েছে।

এরপর 'ঠাকুমা ও তাঁর বন্ধুরা' অংশে তিনি বলেছেন শ্রেণীচেতনাহীন ঠাকুমার বর্ষীয়সী বন্ধুদের কথা। দুপুরের শেষ থেকে সন্ধ্যার শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সুখদুঃখের কথা চলত। ছোটবেলায় তিনি তাঁদের প্রত্যেককে গভীর মনোযোগে নিরীক্ষণ করতেন। এঁদের মধ্যে চারজনের প্রতিকৃতি তিনি চিত্রণ করেছেন। কিন্তু আলাদা আলাদা করে কোনটা কোন জন তা বোঝা মুশকিল।

'বাস্তু' অংশে তিনি প্রথম নিজের ছবি আঁকছেন টেক্সটটিতে। অন্যান্য ছবিগুলির মতো এটিও স্ক্রিবলের গতেই করা। তবে তাতে পারসপেকটিভের ধারণা স্পষ্ট। একটি মাটির ঘর, ঘরের উপরে করুগেটেড শীট, চালে তিনটে পাখি বসে আছে, একটি লাউ গাছ লতিয়ে উঠেছে, ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। পাশের ছোট ঘরটি হোগলা পাতা বা ছেঁচা বেড়া, তার চালটা খর কিংবা হোগলা পাতার, লাউ গাছ লতিয়ে ঐ চাল থেকে করুগেটেড চালে এসেছে। তার পাশে একটি বড় গাছ।

দূরে অন্য কোনো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তিনি 'আমি'কে এঁকেছেন যেন তা যে কোনো শিশু হতে পারে। কারণ তাঁর কাছে বড় নয় নিজের ছবি যথাযথ করে আঁকা; বরং ঘটে যাওয়া বাস্তবের, স্মৃতিতে ফিরে আসা কল্পনাটাকেই তিনি ধরে রাখতে চেয়েছেন।

তিনি উল্লেখ করেছেন বনে, মাঠে, বাগানে, ভিটের এদিকে সেদিকে শিশুদের চিরদিনের নিজস্ব ভাণ্ডার। গ্রীষ্মের দুপুরে খাওয়ার পরে বাড়িটা যখন শুনশান তখন ছোটরা আঁকশি হাতে বেরত। তারপর শুরু হত বনের মধ্যে রোমাঞ্চকর অভিযান। শিশুদের অস্তিত্ব সেখানে কেউ টের পেত না। তারা জঙ্গলের ফল, মটরশুঁটি ইত্যাদি খেত। এই অংশতে আবার একটি ছবি ইলাসট্রেশনে এসেছে – তিনি নিচু হয়ে মাটিতে বসে মটরশুঁটি ছিঁড়ছেন এমনটাই দেখতে পাওয়া যায় ছবিতে।

কালবৈশাখী হলে বালক-বালিকাদের সাথে তিনিও ছুটতেন আম কুড়োতে। তিনি বলেছেন আমের চেয়েও ঝড়ের কেন্দ্রে, জমাট কালো মেঘের কেন্দ্রে নিজেকে পাখির পাখার মতো উড়োতে বড় ইচ্ছে করত। এই বর্ণনার সঙ্গে ২৬ পাতায় যে ছবিটি যুক্ত সেটিতে দেখা যায় এক কল্প অবয়ব ভেসে উঠছে জঙ্গলের ভেতরে। যেন কোন কল্পলোকেরই বাসিন্দা প্রাণীটি। ছবিটি যেন পরাবাস্তবতার সামনে হাজির করে দ্রষ্টাকে। ছবিটি কালবৈশাখী ঝড়ের বর্ণনা দিচ্ছে তাতে যে ছোট ছেলেটিকে দেখা যায় তার গায়ে কোনো আবরণ নেই। এটি যদি রূপক হয় তাহলে স্বভাবতই আমাদের মন সেই কার্যকারণ সম্পর্কটি খোঁজার চেষ্টা করে এবং তার উত্তর হিসেবে আমরা হয়তো বলতে পারি যে মানুষের চরম সারল্য তার নিরাবরণতায়। একইরকমভাবে সেই বর্ণনাটি পাঠের সময় আমরা দেখি লেখক বলছেন তার ঝড়ে পাখির মতো উড়ে যেতে ইচ্ছা হত। সেই বর্ণনা আমাদের মনে যে ছবির জন্ম দেয় সেটিও অত্যন্ত সারল্যে ভরা।

'সাপ' বলে অংশটিতে বলা আছে পশ্চিম পুকুরের পাশ দিয়ে উত্তরের ঘরের পেছনে যে গভীর ছোট ডোবা সেখানে বর্ষার শেষে একদিন গিয়ে হাজির হয়েছেন। একটা ঝুকে পড়া গাছের অদ্ভুত আঁকাবাঁকা ডালের খানিকটা টলটলে জলের মধ্যে ডুবে ছিল, যেখানে উড়ন্ত নীল আকাশ আর উড়ো সাদা মেঘের ছবি যেন জলের মধ্যে নীল ময়ূর ও সাদা ময়ূরীর নাচ। তিনি তা তন্ময় হয়ে দেখেছিলেন। এই বর্ণনাটিই এমনিতে একটি অসাধারণ ছবি। তার মধ্যে একটা বুনো জাতসাপ ঝোপের ভেতর থেকে খুব ধীরে ধীরে অলসভাবে এগোতে এগোতে জলে ডোবা ডালের প্রান্ত ধরে নিয়েছিল। চেরা জিভ দিয়ে যেন সে জলের গা কয়েকবার চেটেছিল। তারপর আবার ঢেউয়ের মতো দেহটি তুলে বাদামী ডালের ওপর একটা কুচকুচে কালো ডাল হয়ে মন্থর গতিতে এগিয়েছিল। এই সচল বর্ণনাটি একটি স্থির ছবি হয়ে ধরা পড়ে ইলাসট্রেশনে।

একবার দাদুর সাথে পশ্চিম পুকুরের পাড় দিয়ে যে শুঁড়িপথটা খালের দিকে গেছে সেই পথের বাঁ পাশের ঘন বনে ধুকতেই মানুষের সাড়া পেয়ে দুটো গোসাপ কোন দিকে চলে গিয়েছিল। বিভিন্ন বুনো লতা দিয়ে ঘেরা চারিদিকে ঠাণ্ডা ছায়া। সেখানে এক বুড়ো আর এক বালক মিলে কাজের খেলা করেছিল। মাটি আঁকড়ে থাকা একটি মহাবল কন্দকে উপড়ে তোলার জন্য দুজনে পরিশ্রম করতে থাকে। সারাগায়ে মাটি মাখামাখি হয়ে গেলে লেখক উপলব্ধি করেন 'মাটির সঙ্গে ঘাম আর আনন্দ'। 'দাদু ও হাতে খড়ি' অংশটিতে দাদু মানুষটি কেমন ছিলেন তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন – দাদুর অর্থ উপার্জনে বিন্দুমাত্র মন ছিল না, তাঁর জীবন একপ্রকার রহস্য, তিনি স্মৃতিসঙ্গহীন ও আশা-তাড়নাহীন সময়াতীত দেশে যেন বাস করেন। একবার স্ত্রী ও সন্তানদের ছেড়ে সম্পূর্ণ অকারণে বাড়ি ছেড়ে চলে যান ও চার বছর পর হঠাত

একদিন ফিরে আসেন। মনীন্দ্র গুপ্ত যেমন বলেছেন দাদুর দেহ কিন্নরের মতো হলেও মুখটা ফকিরের মতো, ফকিরের মতো তাঁর জীবনও। দুটো ধুতিতেই সারাবছর চলে যায়, একজোড়া চটিজুতোয় দু বছর, আর একটা ফ্লানেলের পাঞ্জাবি ও একখানা আলপাকার চাদরে নাকি তাঁর পুরো একজীবনের বার্ধক্য কেটে গিয়েছিল। তাঁর তামাক তৈরি করাটাও ছিল এক অনুষ্ঠান। এহেন দাদুর কাছেই চার বছর বয়সে লেখকের হাতে খড়ি হয়। তারপর আরও অনেক কিছু তিনি বলেছেন। কিন্তু ছবিতে দেখিয়েছেন দাদু ও তাঁর বনে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য। বর্ণনাতে আছে যে দাদু যখন তাঁকে নিয়ে পথ হাঁটতেন তখন তাঁদের নিজেদের মনে হত মুক্ত পুরুষ। কোন নির্দিষ্ট একটি ঘটনার ছবি তিনি আঁকেননি, এই অংশটিই ইলাসট্রেশনে এসেছে।

'মুনশিবাড়ি' অংশে তিনি বলেছেন যে একরকম 'আশঙ্কাভরা' অনুভূতি তাঁর হত মুনশিবাড়ি গেলে। তা ঠিক ভয়ও না, এক জন্য জগতের অনুভূতি। এর বর্ণনাও অপার্থিব, স্বর্গীয়। এবং জায়গাটি নিস্তব্ধ। একদিন সেই মুনশিবাড়ি থেকে একা একা ফিরতে গিয়ে তিনি মাথার ওপর অজস্র লাল ফড়িং দেখতে পায় – লেখার এই ছবিটি তিনি রেখায় নিয়ে আসেন। একসাথে এত লাল ফড়িং তিনি কখনো দেখেননি। লেখার ভাষাটাই এমন যে প্রত্যেক লাইনে ছবি তৈরি হচ্ছে, আবার তার সাথে ছবিতে দেখতে পাই ড্রয়িং-এর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য 'foreshorten' পদ্ধতি ও ভারতীয় চিত্রশৈলী কিভাবে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে। ছবিটির মধ্যে যেটুকু অংশে ফড়িং-এর ড্রয়িং করা হয়েছে সেই অংশটি চিরাচরিত ভারতীয় চিত্রশৈলীকে অনুসরণ করে। তার কারণ ফড়িংগুলির ক্ষেত্রে দূরত্ব বা perspective-এর যে ধারণা সেটি একমাত্রিক, যা ভারতীয় চিত্রশৈলীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এবং ফড়িং বাদে যে অংশগুলি আছে সেগুলি ত্রিমাত্রিক, যা পাশ্চাত্য শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এই পর্বে বেশিরভাগ ছবিগুলি প্রকৃতি ঘেঁষা নৈসর্গিক, এমনটাই এঁকেছেন মনীন্দ্র গুপ্ত। ৬৪ পাতায় ‘নৌকাযাত্রা, মাঝি’ অংশে আমরা পাঠ করি লেখকের ধনদিদির বড় মেয়ে লবিপিসির বিয়ে হয়েছিল লেখকের গ্রাম থেকে দূরের এক গ্রামে। একবার নৌকো করে লবিপিসির শ্বশুরবাড়ি যান লেখক। সেখানে সেই বাড়ির পুকুরঘাট থেকে জলপথ ধরে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় যাওয়া যায় – এমনটাই লেখকের কল্পনা। একদিন নির্জন অপরাহ্ণে খালের বাঁকে ভাটায় জল সরে গিয়ে পৃথিবীর কাদার পিঠ একটু ভেসে উঠেছে। সেই কাদায় ধূসর কয়েকটি কাদাখোঁচা পাখি চঞ্চল হয়ে পোকা খুঁজছিল। ঘুম থেকে উঠে এই দৃশ্য দেখেছিলেন লেখক আর তাঁর দৃশ্যটি নৌকো আবার বাঁক ঘুরতেই মিলিয়ে গেলে লেখকের মনে হয় যে তাঁর ঘুমন্ত প্রাণের কোনো অবোধ পিপাসা তিনি যেন রেখে এলেন সেখানে। স্মৃতিতে থাকা অপাপবিদ্ধ নির্জন সেই জায়গাটিতে ছোট পাখিগুলির প্রাণমন ডুবিয়ে খাবার খোঁজার দৃশ্যটি তিনি ইলাসট্রেশনে এনেছেন।

‘অ্যাডভেঞ্চার: বর্ষায়’ নামক অংশটিতে আছে একটি ছবি। কোনো এক গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফিরলে লেখকের ছোটপিসিমা আর সেজোপিসিমার চার ছেলেমেয়ে খবর পেয়ে তাদের দূর গ্রামের বাড়ি থেকে একসঙ্গে এসে হাজির হয়েছিল। ঠিক হয় তাদের দলটা ছোটপিসিমার বাড়ি হয়ে সেজোপিসিমার বাড়ি যাবে। লেখক বর্ণনা করেন যে তাদের মধ্যেকার আনন্দ দিগন্ত পর্যন্ত বাতাসের সঙ্গে হু হু করে ছুটে চলেছিল, শূন্যে রামধনুর মতো তাদের ফুর্তি ঠিকরে বেড়াচ্ছিল। তাদের প্রত্যেকের শরীর লঘু, পাখির মতো শিষ দিতে সক্ষম, চাইলে উড়তেও পারা যায়। এই অংশটিই ইলাসট্রেশনে উঠে এসেছে। তারা ছিল পাঁচজন, কিন্তু ছবিতে দেখা যাচ্ছে ডানদিকে পাঁচজনের পরে একজন পেছনে হেলে গিয়ে দুহাত উপরে

তুলে রয়েছে আর সকলের মাথার ওপরে একজনের দেহ পাখির মতো শূন্যে ভাসছে। বড় হয়ে লিখেছেন ও ছবিগুলি এঁকেছেন, কিন্তু কল্পনাপ্রবণ মন তাঁর ছোটবেলা থেকেই ছিল। লক্ষ্য করে দেখুন, মনীন্দ্র গুপ্ত লেখার সবটুকু ইলাসট্রেশনে আনছেন না। একটা দুটো বাক্য বা বহিঃপ্রকাশ ছবি হয়ে ধরা পড়েছে। ছবিটির বাঁদিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনকে যেভাবে আঁকা হয়েছে তাতে অদ্ভুতভাবে ইজিপশিয়ান হায়ারোগ্লিফিক্স'এর পক্ষীদেবতার মিল খুঁজে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে এটি যদি স্বাধীনতার বা মুক্তচিন্তার রূপক হিসেবে আমরা দেখি তাহলে হয়তো খুব ভুল হবে না। একইরকমভাবে এর যে লিখিত বিবরণ সেক্ষেত্রেও অদ্ভুত আনন্দে পাখি হতে চাওয়ার যে স্বাদ তাও সেই স্বাধীনতাকে আস্বাদ করার বা চিন্তাকে উন্মুক্ত করার প্রকারান্তর।

লেখার 'তার পর' নামক অংশে দেখতে পাই যেই রেইন ট্রি'র তলায় তিনি শুয়ে থাকতেন প্রায়ই, সেটিকেই তিনি ইলাসট্রেশন করছেন। ইলাসট্রেশনে ছোট ছেলেটি গাছের নীচে পায়ের ওপর পা তুলে গভীর চিন্তামগ্ন। যদি রেখার বর্ণনাতে যাই, এটি একেবারেই একটি স্ক্রিবল। কালি ও কলমে কাজ করার সময় যে cross hatching পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, এটি সেই পদ্ধতিতে করা। লেখকের লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী যে সময়ের বর্ণনা করা হয়েছে, সেসময়ে লেখক একটি রোগাক্রান্ত ছিলেন। যেখানে ওনার পায়ের পাতা ছিল ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু ছবিতে আমরা দেখতে পাই চিন্তামগ্ন ছেলেটির পায়ে কোনো ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন নেই। বরং অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে তার বাঁ হাতটি জ্ঞানত বা অসচেতনতাবশত একটু ভুল ড্রয়িং করা। যেখানে বাঁ হাতটিকে দেখলে মনে হয় যে সেটি কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত। এই ঘটনাটি অন্য কোনো ইলাসট্রেশনে ঘটেনি। অর্থাৎ এর আগের প্রত্যেকটি ইলাসট্রেশন লিখিত বর্ণনার যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ

দৃশ্যের বর্ণনা প্রদান করে। ব্যতিক্রম এই বিশেষ ইলাসট্রেশনটি, যেখানে আমরা একটি বিষাদের ধূসর ছায়া দেখতে পাই। যদিও বা লিখিত বর্ণনার সঙ্গে ইলাসট্রেশনের খুবই সামান্য অসংগতি চোখে পড়ে, তথাপি এই ইলাসট্রেশনটি আমাদের মনকে ঐ চিন্তামগ্ন ছেলেটির চিন্তা তরঙ্গের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে সক্ষম হয় এবং আমরা পাঠক ও দর্শকরা ঐ বিশেষ সময়ের একাকী রোম্যান্টিকতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই – যা মনীন্দ্র গুপ্তের ইলাসট্রেশনের একটি চরম বৈশিষ্ট্য। যেখানে লেখা ও রেখা একে অপরের পরিপূরক এবং ঘটনাক্রমে তারা নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত কথোপকথন তৈরি করে, যা পাঠক ও দর্শকদের মানসপটে বুনে চলে এক চলচ্চিত্রের মতো চলন্ত ছবির সারি। যেখানে ছবিতে আঁকা সত্ত্বেও যেমন ধরা পড়ে নির্জন দুপুরে একটি বালকের একাকীত্ব; তেমনি ধরা পড়ে একটি মহীরুহের নিবিড় বেষ্টন, যা একটি বড় পরিবারের রূপক হিসাবে যদি আমরা দেখি তাহলে সেই পরিবার থেকে ছিন্ন হওয়ার সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা তার রৈখিক রূপান্তর মাত্র।

এরপর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পর্বে ‘দিদিমা’ অংশে মনীন্দ্র গুপ্ত মৃত্যু আসন্ন হাতিটিকে আঁকছেন। অদ্ভুত দিক থেকে ছবিটি করা। পাড়ের কোনো ড্রয়িং নেই। হাতির পা ও গাছটি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে পাড় আছে সেখানে। হাতিটি পাড়ে উঠতে পারছে না। জলের মধ্যে ডুবে যেন ছবিটা আঁকা হয়েছে, পাড়ে বসে আঁকা হয়নি। হাতিটির যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু প্রক্রিয়ার সঙ্গে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। জল ও মাটি আলাদা করার জন্য জলের ধারার রেখা দেওয়া হয়েছে। এখানে হাতির দাঁত অনুপস্থিত। মরণাপন্ন, অথচ হাতির মুখ যে হাসিহাসি হয় সেটা লেখক ধরেছেন। হাসি এখানে একটি রূপক মাত্র, যা হয়তো আমাদের শেখায় জীবনের ঝঞ্ঝার মাঝেও অবিচল থাকতে। হাতির আশেপাশে কেউ নেই। অদ্ভুত আসন্ন মৃত্যুর একাকীত্ব

যা মনকে ভারী করে দেয়। একই জিনিস যা রেখায় দেখানো হয়েছে তা যখন লেখাতে পাই সেটিও আশ্চর্যজনক ভাবে মনকে পীড়িত করে। সমস্তকিছু জানা সত্ত্বেও মন আশান্বিত হয়ে ওঠে যদি হাতিটি পাড়ে উঠতে পারে! হয়তো সেই ধারনাই মনে জাগানোর জন্য লেখক হাতির পেছনের পা দুটিকে কাদার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে আঁকেননি।

'উপত্যকা' নামক অংশে 'পাউস আএ চেলু দুলাএ' ছবিটিতে হাওয়ার স্রোতটা বোঝা যাচ্ছে। মেঘের কালো হয়ে আসাটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। হাওয়ার দিক নির্দেশটা আছে, ছেলেটির দেহভঙ্গিমায় তা স্পষ্ট। এখানে কিছু রেখা আঁকিবুঁকি থেকে ছবির দিকে গেছে।

'গৌরদাস বাবাজী'র অংশে ছ ফুট লম্বা একজন লোককে আঁকছেন কিন্তু খর্বকায় ভাবে। লোকটি যে সুখী নয় তার প্রকাশ এরকম একটি ভঙ্গী। সেটি লেখার সঙ্গে ছবিটিতেও প্রতিফলিত। দর্শককেও কষ্ট করে খুঁজে নিতে হচ্ছে তার জপমালা ও ভিক্ষার থলিটি। অতিশীর্ণ তার দেহকাণ্ড এবং সে কয়েকটি রোগে সবসময়েই পীড়িত। সেক্ষেত্রে মনীন্দ্র গুপ্তের তুলির আঁচড় বলছে ছ ফিটের বৈষ্ণব অষ্টাবক্রের মতো বসে আছে। তার উচ্চতা সম্পর্কে এবং বসে থাকার বিবরণ সম্পর্কে কোনো চাক্ষুষ বিবরণ আমরা পাচ্ছি না, বরং সেখানে পাচ্ছি তার রোগাক্রান্ত এক মূর্তি। সেক্ষেত্রে লেখা এবং রেখার এই যে পার্থক্য তাই বুঝিয়ে দিচ্ছে সেই বৈষ্ণবের জীবনের জটিলতা ও অভাবের কথা। যা কিনা ইলাসট্রেশন হিসেবে এক রূপক তৈরি করছে সেই রূপক ডানা মেলছে লেখকের কলমের আঁচড়ে।

এরপর 'বৈষ্ণবীদিদি' অংশে বর্ণনার সঙ্গে ছবিটি কিন্তু মজাদার। কারণ রাসের নাচ নাচার সময় এরকমভাবে দাঁড়ায় না লোকেরা। শীর্ণকায় দুজন মহিলা চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। ছবিটিতে আকুলতা

তৈরি হচ্ছে। কেননা বর্ণনা অনুযায়ী এনারা মধ্যবয়স্কা বা প্রৌঢ়াপ্রায়। তাঁদের স্বামী সৌভাগ্য নেই বোঝা যাচ্ছে। তাঁদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং না পাওয়া বোঝানো হয়েছে তাঁদের শীর্ণকায় গড়ন দেখিয়ে। অথচ গাছটা নিখুঁত। দৈন্যতা নেই প্রকৃতিতে। চাঁদ ও তার স্নিগ্ধতা ধরা পড়েছে। যদিও আলোছায়ার খেলাটা নেই।

'বাট্‌ঠি মৌলবী' অংশতে বর্ণনা অনুযায়ী মৌলবী সাহেবের শরীর খর্বকায়। সেটিকে রেখায় যখন দেখতে পাই তখন দেখি পাঞ্জাবীর ঝুল পায়ের পাতা পর্যন্ত টেনে ও হাতের ছোট দৈর্ঘ্য দেখিয়ে খর্বকারত্ব ধরা হয়েছে রৈখিক যুক্তিতে। লোকটির তিন চতুর্থাংশ দেখানো হয়েছে, তাঁর ডানদিকটা নেই। পাশের বাচ্চা ছেলেটির চরিত্র এমনই যে সে কখন কি করে বেড়ায় ঠিক নেই। তাকে শারীরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত খারাপ গঠনে আঁকা। মুখে সারল্যের হাসি ও চুল উসকোখুসকো।

'ইংরেজদের কথা' অংশে মেমসাহেবকে বোঝানোর জন্য মাথায় টুপি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চোখ ঢেকে দেওয়া হয়েছে কেন? মিস্ত্রীদের সামনে বিবস্ত্র হয়ে বাথটবে নামায় সে যে চক্ষুলজ্জাহীন তা বোঝানোর জন্যই কি এটা করা হয়েছে? এই অংশে এরপর আরেকটি মেমসাহেবের ছবিও রয়েছে। সেখানে জায়গাটির মধ্যে রয়েছে পরিচর্যাহীনতা। অবিন্যস্ত অবস্থাতেই মেমকে আঁকা হয়েছে। আর এই ছবির মেমটি বাস্তবের নয়, ডরোথি নামক এক মৃতাকে কল্পনা করে এঁকেছেন মনীন্দ্র গুপ্ত।

'বয়ঃসন্ধি' অংশে করা ইলাসট্রেশনটি আমার মতে মনীন্দ্র গুপ্তের সবচেয়ে নাড়া দেওয়া ইলাসট্রেশন। কারণ এই ইলাসট্রেশনটিই প্রথম যেখানে লেখকের রোম্যান্টিকতা একটি বাহ্যিক এবং শারীরিক রূপ নিচ্ছে। এটি সেই ইলাসট্রেশন যেখানে লেখক একটি বাচ্চা ছেলে থেকে কিশোর হয়ে

উঠছেন। এক অদ্ভুত রূপকের আড়ালে তিনি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁর নিজেকে প্রথম শারীরিকভাবে আবিষ্কারের কাহিনী। তাঁর সেই কাহিনীতে রাজা ইলার ছদ্মবেশে তাঁর অবচেতন তাঁকে জানান দেয় যে তিনি তৈরি। সেটির ধারণা বহন করে ছবিটিও। ছবিটিতে একটি কিশোরী বা প্রায় কিশোরী এক কিশোর এক গলা জলে ডুবে আছে, তার মাথার এলোচুলে একটি রাজকন্যার টায়রা। এই ছবিটিতে একটি অদ্ভুত দৃশ্যিক ভুল আমরা দেখি; যেখানে উন্মুক্ত স্তন ঐ কিশোরী বা প্রায় কিশোরী কিশোর একগলা জলে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তার বক্ষ সৌন্দর্য জলতলের ওপরে থাকে। এই দৃশ্যের বর্ণনা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে একটি বাচ্চা ছেলের অবচেতনে শারীরিক এবং মানসিকভাবে এক কিশোর হয়ে ওঠা। লেখকের লেখনীতে আমরা দেখতে পাই নারী সাহচর্য হিসেবে মাতৃস্থানীয়াদের অথবা বোনেদের। অতয়েব এখানে একটি ধারণা করা যেতেই পারে লেখকের বড় হয়ে ওঠার সময়ের তাঁর বন্ধুবান্ধবদের দলে মেয়েদের উপস্থিতি নেই। সেক্ষেত্রে লেখকের রচনা অনুসারে এই ইলাসট্রেশনের ঘটনাটি একটি দ্বিপ্রাহরিক স্বপ্ন। অথচ সেই স্বপ্ন ছিল এতটাই বাস্তব ঘেঁষা যে লেখক সেখানে জলে ডোবার স্বাদ পেয়ে ছটফটিয়ে ঘুম ভেঙে উঠে পড়েন। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্নের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে তিনি সেই বিশেষ ক্ষণে নিজেকে শারীরিকভাবে আবিষ্কার করেছেন। যার ফল হিসাবে লেখক বেশ খানিকক্ষণ একটি মুহ্যমান অবস্থায় কাটান। এক্ষেত্রে লেখকের লেখা এবং রেখার মধ্যে এক অদ্ভুত যোগসূত্র তৈরি হয়। সেই যোগসূত্রের একপাশে থাকে চিরাচরিত ট্যাবু এবং তা উল্লঙ্ঘনের ভীতি ও বিষাদ। অপরদিকে থাকে সদ্য কৈশোরের যৌবনপ্রাপ্তির আনন্দ। ছবিটি এক অদ্ভুত দুনিয়া নির্মাণ করে যেখানে একজন কিশোরের মানসিক ও শারীরিক রূপান্তর ঘটছে। আমরা যখন তা লেখায় পড়ছি তখন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি একটি সদ্য কিশোরীকে।

অপরক্ষেত্রে যখন আমরা তা রেখায় দেখছি তখন তার শারীরিক আবেদন আরও তীব্র হচ্ছে। এই দুইয়ের মিলেমিশে এক অত্যন্ত আকর্ষক কিশোরী বা প্রায় কিশোরী এক কিশোর আমাদের মনের ক্যানভাসে পূর্ণতা পাচ্ছে। এক্ষেত্রেও এই কথোপকথনের যে ধারাটি সেটি অব্যাহত যা রূপকের আড়ালেই বলে দেয় লেখকের কিশোরকালের প্রথম শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের কথা।

তৃতীয় পর্বে 'ফিরে আসা এবং ছেড়ে যাওয়া' অংশের ছবিটি একাকী পিঁপড়ের ছবি। এইখানে ছবিতে একটি গুরুত্ব আরোপিত হয় কারণ প্রাকৃতিকভাবে পিঁপড়ে দলবদ্ধভাবে থাকে। এই একাকীত্ব হয়তো এক একলা কিশোরের সাংসারিক প্রতিচ্ছবি। লেখকের কথায় আমরা পাই তাঁর অতি প্রিয় রেইন ট্রির তাঁর পিতা কর্তৃক কেটে ফেলার কথা। তাই হয়তো লেখকের রেখায় গাছের গুঁড়িটির ওপরে ডালপালাহীন ভাবে কিছু পাতার সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায় যা সেই একাকী পিঁপড়ের রাজগদির মতো। ছবিটিতে একটি অদ্ভুত পারসপেকটিভের ব্যবহার আছে যেটি ঐ কেটে ফেলা গুঁড়িটাকে হিমালয়ের উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। এই উচ্চতা সৃষ্টি করে ছবির বাঁ দিকে একটি উড়ন্ত পাখির স্কেচ, যা দৃশ্যত গাছের গুঁড়ির উপরিতলের রেখার নীচের। এরফলে দর্শকের চোখের পর্যায় বিভ্রমপ্রাপ্ত হয়। আর পিঁপড়েটিকে আঁকা হয় বিশালাকার। যেখানে এটি মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে এক কিশোর তাঁর কৈশোরের থেকে যৌবনপ্রাপ্ত হচ্ছে। কারণ এই সময়েই বিশেষত ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাস এই বয়সী যেকোনো ছেলেকেই নিজেকে অধীশ্বর ভাবার এক অদ্ভুত শক্তি প্রদান করে, যা অত্যন্ত প্রাকৃতিক। অপরদিকে আগেই কথিত একাকীত্বের ফলস্বরূপ পিঁপড়েটি একা যা লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী এক অভিযাত্রী স্বরূপ। সেই অভিযাত্রী সমতল থেকে কৈলাস যাত্রা করে। যাত্রাপথে সে

স্বাভাবিকভাবে হিমালয় আরোহণ করে। এই কল্পনা লেখকের অতি দৃঢ়চেতার পরিচায়ক, যা আমাদের লেখকের পরবর্তী জীবনে একজন যোগ্য পুরুষ হিসেবে নিজেকে গঠন করার বার্তা প্রদান করে।

শহুরে কলকাতার একটি জীবনানন্দিক বর্ণনা '১৯৮১-এর কলকাতা' অংশের ছবিটি। এই ছবিটির একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল যে এটি ইলাসট্রেশন ও পেন্টিং'এর মধ্যেকার সুক্ষ্ম বিভেদ অতিক্রম করে পেন্টিং'এর দিকে চলে যায়। একটি স্বপ্নের যদি দৃশ্যে বর্ণনা হয় তাহলে এই ছবিটির কথা ভাবা যেতে পারে। ছবিতে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি উপাদান তখনকার শহুরে কলকাতার এবং সেখানকার জীবনযাত্রার কথা অনুমান করায়। মাটির নীচ দিয়ে চলা জলের লাইন দুটি বিশেষরূপী ট্যাপ থেকে সবসময় প্রবাহিত জল। কাছে এবং দূরের বাড়ির গঠন আমাদের বারবার বলে এখনকার উত্তর কলকাতার সঙ্গে সাদৃশ্য। এক্ষেত্রে দুটি অনাবৃত নারী শরীর ছবিটিতে দৃশ্যত কোনও মনোবিকার না ঘটিয়ে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে ছবিটি নারী বা স্ত্রী স্বাধীনতার পরে আঁকা। এক অদ্ভুত ব্যাঙ্গোক্তি এই ছবিটি জুড়ে আমরা দেখতে পাই। কারণ শহরের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, যা হয়তো খুবই সাধারণ ব্যাপার কিন্তু কলকাতার এক চিরাচরিত মানসিকতার ফলে তাই হয়ে ওঠে অত্যন্ত অসাধারণ একটি কিছু। এই ছবিতে প্রথম আমরা দেখতে পাই ছবির ফ্রেমিং বা বর্ডার লাইন তৈরির চেষ্টা। যা হয়তো আসে লেখকের অবচেতনে থাকা শহুরে বিন্যাস এবং অযথা পরিমিতিবোধের চেষ্টার দরুন। ছবির আরেকটি বিশেষত্ব হল এই ছবিটিতে বহুক্ষেত্রেই লেখকসিদ্ধ সূক্ষ্ম রেখার বদলে মোটা রেখা এবং জমাট রঙ ব্যবহৃত হয়েছে।

'শটিবন ও ম্যালেরিয়া' অংশের ছবিটিও আগের ছবির পদ্ধতির অনুকরণে করা। এক্ষেত্রে লেখক একটি পুরুষ শরীরকে অদ্ভুতভাবে মাটির নীচে দেখিয়েছেন। সেক্ষেত্রে সরু আঁচড়ের বদলে মোটা চ্যাপ্টা

পেন ব্যবহার করা হয়েছে। লেখকের কথা অনুসারে মানব শরীরটির নাক থেকে পদ্মগাছ জন্ম নিচ্ছে। একটি রেখা দ্বারা মানব শরীরটিকে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হয়েছে। লেখকের ছবির ধারা অনুযায়ী এই মানব শরীরটিও বেনামী। লোকটির এরকম নিশ্চিন্ত শুয়ে থাকা যে আদতে লেখকের দৃঢ়চেতার পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একটি অত্যন্ত সরাসরি ও আগ্রাসী ইলাসট্রেশন পাই 'সখা রাইফেল' অংশে। আপাতদৃষ্টিতে এটি লেখকের সৈনিক জীবনের একটি বিশেষ ক্ষণের যথাযথ বর্ণনা মনে হলেও কিছু প্রশ্ন এসেই যায়। যেমন গোটা শরীরের তুলনায় লোকটির মাথা এতটা ছোটো কেন? আবার লোকটির হাতে উঁচিয়ে থাকা বন্দুক, তার বেয়নটটি জায়গার অভাবে পুরোটি আঁকা যায়নি। শুধু কি সেকারণেই সেটিকে আলাদা করে পাশে আঁকা হয়েছে? লোকটির সামরিক পোশাক দেখলে বোঝা যায় পদমর্যাদায় লোকটি পদাতিক সৈন্য অন্তর্ভুক্ত একজন সামান্য ক্যাডেট মাত্র, যার হাতে একটি এক নলা থ্রী নট থ্রী বন্দুকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়কার সংস্করণ। যে দুটি প্রশ্ন শুরুতেই লেখা হয়েছে তার সম্যক উত্তর হিসেবে একটি ধারণা মাথায় আসে তা হল রোজকার প্রশিক্ষণে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর একজন শৈল্পিক চিন্তার মানুষের মাথার কাজ কমে যাওয়ার ফলেই কি মাথাটি ছোট করে আঁকা হয়েছে? এবং দৈহিক সক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার দরুনই কি বাকি দেহ পরিপুষ্ট আকারে করা হয়েছে? অপরক্ষেত্রে হাতে একটি বন্দুক বিদ্যমান এবং বন্দুকের বেয়নটটি আলাদা করে আরেকটি মারণাস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ বোধহয় পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কোনোকিছুর অস্তিত্বকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

'শুটিং ও বেয়নট যুদ্ধ' অংশটি মনে অদ্ভুত প্রশ্ন তৈরি করে যে এই লোকগুলি আসল না নকল! তার কারণ স্বরূপ লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী এগুলি খড়ের তৈরি মনুষ্যাকৃতি পুতুল বিশেষ। এদের উপরেই বেয়নট চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই ছবিতে তিনখানি মানুষের গড়নের এরকম পুতুল দেখা যায়। দেখার মতো বিষয় হল তিনটি পুতুলই মাথা নীচু করে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। এর কারণ হিসাবে আনুমানিকভাবে বলা যেতে পারে এদের অস্তিত্ব শুধুমাত্র বেয়নটের খোঁচা হওয়ার জন্য। এই ইলাসট্রেশনটিতে লেখকের রিয়ালিস্টিক ড্রয়িং'এর অভ্যাস পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকটি পুতুলের মাথাতেই টুপি লাগানো, যা হয়তো তাদের অস্তিত্ব সংকটের হাত থেকে রক্ষা করে। কারণ টুপিটি খুললে এবং টুপিটি পড়লে তাদের দুবার দুরকম অস্তিত্ব সামনে আসে। যা সৈনিক জীবনের একঘেয়ে প্রশিক্ষণে একটু পরিবর্তন নিয়ে আসে।

লেখক বর্ণিত যে যাত্রাটা আমরা লেখকের লেখা ও রেখার সঙ্গে পেরিয়ে আসি সেখানে অনেক্ষেত্রেই ইলাসট্রেশনের মাধ্যমে লেখকের ছেড়ে যাওয়া কিছু সূত্রকে রূপক আখ্যা দিতেই পারি। যে রূপক লেখকের লেখার রোম্যান্টিসিজমের পরিপূরক হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে *অক্ষয় মালবেরি*'র যে একটি নান্দনিক সারল্য আছে তার সঙ্গে মনীন্দ্র গুপ্তের করা ইলাসট্রেশনগুলি কথোপকথন তৈরি করে। কারণ ইলাসট্রেশনগুলিতে ছেড়ে যাওয়া সূত্রগুলি আমাদের দর্শকদের ছবিগুলি সম্পর্কে লেখক কথিত কথার বাইরে ভাবতে বাধ্য করে। একইরকমভাবে তাঁর লেখাও আমাদের পাঠকদের মনে একটি কল্পলোক তৈরি করে। ঠিক সেই মুহূর্তে পাঠকমন এবং দর্শকমন দুজনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয় তার ফলাফল *অক্ষয় মালবেরি*'র অক্ষয় যাত্রা। স্বভাবতই আমাদের মনে যে পরিপূর্ণ ছবিটি তৈরি হয় তার মূলে থাকে দেখতে

দেখতে পড়া কিংবা পড়তে পড়তে দেখা, পড়তে পড়তে মন যেমন কিছু খোঁজে তেমন দেখতে দেখতে চোখ যেন কিছু খোঁজে – এই সংযোগ পাঠকমন ও দর্শকমনকে একাত্ম করে দেওয়ার ফলেই আমরা রেখার রূপকে লেখায় খুঁজি। একইভাবে লেখার সারল্যকে রেখায় দেখতে পাই। এই যে মানসিক সংযোগ সেই সংযোগের মূলেই থাকে লেখা ও রেখার মধ্যে চলতে থাকা নিরন্তর কথোপকথন।

তৃতীয় অধ্যায়

‘অথর’-এর রূপান্তর এবং আত্মজীবনীর সীমায়িত প্রেক্ষিত

৩.১ পাঠ ও পাঠকের জন্ম-পুনর্জন্ম

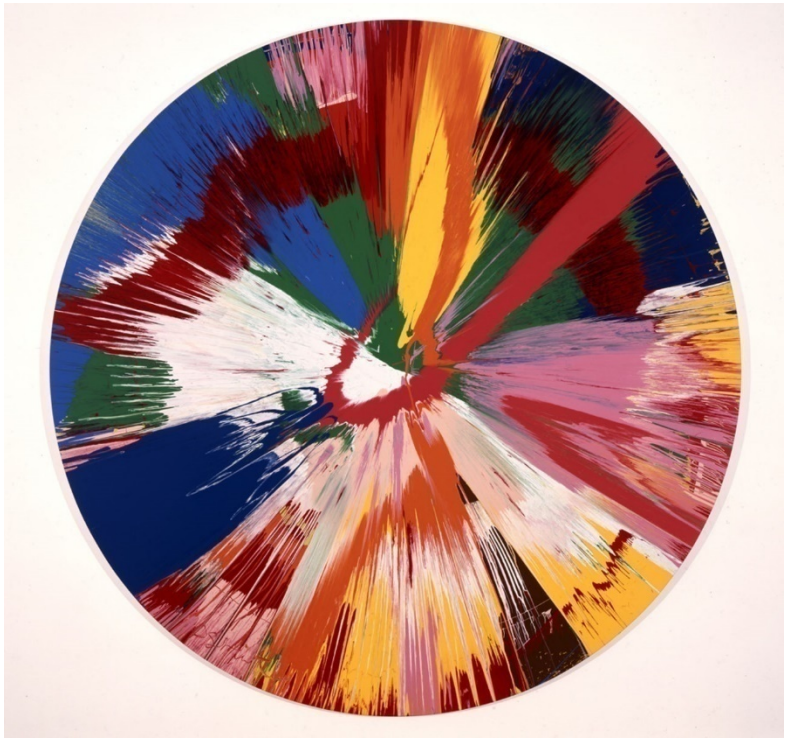

ড্যামিয়েনহার্স্ট-এর (Damien Hirst) এই 'স্পিনপেইন্টিং'-এ[45] বৃত্তের ভেতর উজ্জ্বল রঙ গুলো যেন গতি প্রাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং রঙের প্রভাবে বৃত্তের কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বহু রঙের সমাহার, মিশ্রণ ও কেন্দ্র-বিমুখতা (centrifugal) ছবিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সুব্রত সরকার 'ফারেনহাইট ফোর ফিফটি ওয়ান ডিগ্রি'[46]-তে লিখেছেন – "যে-কোনো লেখাই হল আসলে এক ত্রিভুজ। লেখক, পাঠক ও লেখাটি এর তিন বাহু। কিন্তু রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই ত্রিভুজ থেকে লেখকের বাহুটি প্রথমে খসে পড়ে। অন্য দুই বাহু এবার যাত্রা শুরু করবে সময় থেকে মহাসময়ের দিকে। কিন্তু যাত্রা বহুদূরের হলে তো পাঠকেরাও বদলে যাবেন। এমনকি হয়তো দেখা গেল লেখাটির জন্মভাষাও বেঁচে নেই। তাহলে কি লেখাটিই একমাত্র ধ্রুব? না বহুদিনের পুনর্পাঠ তাকে একদিন ক্লান্ত করে তুলবে? সে হয়তো এখন হারিয়ে যেতে চাইছে বিশাল গ্রন্থসাগরের গণনাতীত সংখ্যায়। অথবা ছদ্মবেশে, নতুন চেহারায় ফিরে এসেছে, নবীন-গ্রন্থের মধ্যে।..." অর্থাৎ লেখক-পাঠ-পাঠক কোনোটিই অক্ষয় নয়, কোনোটিই কেন্দ্র হয়ে থাকতে পারে না – উপরের ছবিটিতে যেরকম কেন্দ্র গুলিয়ে গেছে, সেরকম। তবে 'রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই ত্রিভুজ থেকে লেখকের বাহুটি প্রথমে খসে পড়ে' – এখান

---

[45]ছবিটির নাম 'Beautiful, pop, spinning ice creamy, whirling expanding painting'। প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিল লন্ডনের Waddington Gallery-তে, ১৯৯৫সালে। 'Spin art' ছবির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি বিশেষ ফর্ম, সাধারণত মসৃণ ও উজ্জ্বল শক্ত কাগজের ওপর বিভিন্ন রঙের প্রয়োগে এধরণের ছবি প্রস্তুত করা হয়।

[46] সুব্রত সরকার, *কবিতা সংগ্রহ,* (রাবণ, ২০১৬), ২৬৬.

থেকে বর্তমান আলোচনা অগ্রসর করা যেতে পারে। লেখকের বাহু প্রথমে খসে পড়ার কারণে প্রবন্ধের শিরোনামে আমি পাঠ ও পাঠককেই রেখেছি। কিন্তু বিষয়টির এত সহজে নিষ্পত্তি হয় না।

বাংলায় 'Author' কে লেখক বললে অসুবিধা আছে। ভারতবর্ষে অথরের ধারণা ইউরোপ থেকে আগত। ফিক্সড টেক্সটের ধারণাও ছিল না এদেশে। অখণ্ডনীয় নির্ধারিত স্পষ্ট পাঠের ধারণা অনেক পরে এসেছে। অথর শব্দের সাথে যেমনি যোগ রয়েছে অথরিটির বা আধিপত্যের, লেখক শব্দের সাথে যোগ রয়েছে লেখার – যে কেউ লিখতে পারে। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অথ বি-নির্মাণ' প্রবন্ধে 'কে অথর'[47] অংশে 'অথর' ও 'লেখক' শব্দদুটি যে এক নয় তা ব্যাখ্যা করেছেন 'Author'-এর ব্যুৎপত্তি-গত উৎস ভেঙে ভেঙে দেখিয়ে। রোলাঁ বার্থ ও মিশেল ফুকো দুজনেই এই প্রভেদ নিয়ে সচেতন ছিলেন বলেই তাঁদের দুজনের টেক্সটের নাম যথাক্রমে 'The Death of the Author' ও 'What is an Author'। অথর একটি মডার্ন ফিগার। সাধারণভাবে মধ্যযুগের শেষের সময় থেকে ব্যক্তির গুরুত্ব খুব বেশি করে সামনে আসতে শুরু করেছিল। বার্থ বলছেন, "It is thus, logical that in literature it should be this positivism, the epitome and culmination of capitalist ideology, which has attached the greatest importance to the 'person' of the author."[48] এই 'culmination of capitalist ideology' প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসব মিশেল ফুকোর 'What is an Author' নিয়ে আলোচনার সময়।

---

[47] শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়-কে অনুসরণ করে বাংলায় আমি 'Author'কে 'অথর'-ই রেখেছি।

[48] Roland Barthes, *Image Music Text*, (Fontana Press, 1977), 143.

ফুকোর লেখার আগে বার্থ 'The Death of the Author'-এ মূলত যা বলেছেন সেগুলি কিছুটা মাথায় রাখা প্রয়োজন। কেন লেখকের (অথরের) বাহু সবার আগে খসে পড়ে বা অথরের মৃত্যু ঘটে তা বার্থের নিবন্ধটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রবন্ধের শুরুতেই বার্থ বালজ্যাকের 'সারাসিন'('Sarrasine') গল্পের কয়েকটি লাইন তুলে দিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে মন্তব্যগুলির কর্তা হিসেবে কার স্বর আছে? এর উত্তরে তিনি বলেন - আমরা নির্দিষ্ট করে কখনোই এটি জানতে পারব না। কারণ "writing is the destruction of every voice, of every point of origin"[49]; যেকোনো ব্যক্তিগত পরিচয় লেখার ভেতর হারিয়ে যায়, অথর নিজের মৃত্যুতে প্রবেশ করে। এই যে লেখনীর ক্রিয়ার সাথে জড়িত বিশৃঙ্খলা, এটিই কোনো উৎস বা কেন্দ্র বা একত্বকে খারিজ করার ক্ষমতা রাখে। ধরা যাক, আমি ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার' পড়ছি, পড়তে গিয়ে আমি যেই যেই প্রশ্নের সম্মুখীন হব সেগুলির উত্তর গোর্কির লেখা থেকেই বা তাঁর ব্যক্তি জীবনের যেসব ঘটনা পাওয়া যায় সেখান থেকেই পাওয়া যাবে – এরকমটা নয়। যদিওবা সাহিত্য সমালোচনায় অনেকক্ষেত্রে সেরকম প্রত্যাশা করে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করা হয়। স্রষ্টার ওপর তৈরি হওয়া এধরণের কোনো বিশ্বস্ততা বস্তুত কল্পনা, তাই সেগুলোর কোনোটাই মেনে নেননি বার্থ। কারণ ভাষা কোনো স্বচ্ছ মাধ্যম নয়, আভিধানিক অর্থ নির্দিষ্ট কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তাও পরিবর্তিত হওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা পাই। ভাষায় একটি শব্দ নতুন অর্থকে উন্মুক্ত করে। এমনকি অভিধানে একটি শব্দের অর্থ বোঝাতে আরও এক বা একাধিক শব্দ সামনে রাখা হয়, সেই শব্দগুলিরও আবার প্রতিটির আলাদা আলাদা মানে রয়েছে – সুতরাং একটি শব্দ আসলে আরও অনেক শব্দ ও অর্থের সমাহার।

---

[49] Ibid.

সাইন, সিগ্নিফায়ার ও সিগ্নিফাইডের সম্পর্কে সিগ্নিফায়ার হল আপতিক, যেখানে একক অর্থ বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা সর্বদা কাজ করে আর পাঠের সময় ভাষা কথা বলে, অথর না। একটি পাঠ আরও অনেক পাঠের সমাহার (text আসলে intertext) এবং পাঠের ক্রিয়াটি বহুস্তরীয়। টি.এস.এলিয়ট 'Tradition and Individual Talent' প্রবন্ধে বলেছেন যে একজন কবি তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের থেকে কোথায় আলাদা এটা ভেবে আমরা আস্বস্ত হতে চাই – এই ভিন্নতার বোধ আমাদের সুখ দেয়। কিন্তু কোনও কবির এমনকি কোনও শিল্পীরই একক ভাবে কোনো কাজের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। 'The Death of the Author'-এ ব্যক্তিবাদিতার বিপক্ষে সক্রিয়ভাবে অর্থ তৈরির ওপর (writerly) জোর দেওয়া হয়েছে। "The text can be read without the father's signature''[50]- এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' কবিতার একটি লাইন আছে – "আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম"[51] । পাঠের ক্ষেত্রে টেক্সট লিখিত হয়ে যাওয়ার পর অথরকে অতীত বা মৃত ভেবে নেওয়া চলে। অথরের আর প্রয়োজন হয় না, সে উধাও হয়ে যায় ও সেই শূন্যস্থানে চলে আসে পাঠক। হ্যারী পটার সিরিজের দ্বিতীয়টিতে, *Harry Potter and the Chamber of Secrets*[52], হ্যারি একটি বই পায় এবং বইয়ের লেখক টম রীডলের সাথে নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে

---

[50] Ibid, 161.

[51] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতা*, (ত্রিবেণী প্রকাশনী, ১৯৮৫), ৪০.

[52] J.K. Rowlings, *Harry Potter and the Chamber of Secrets*, (Bloommsbury, 2014), 254-255.

বইটি অবজ্ঞা করতে পারে না। হ্যারির আগ্রহ ক্রমশই বেড়ে চলে, শেষে দেখা যায় 'টম রীডল' বইয়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই না, এবং বইটি যখন তার হাতে আছে তখন বইয়ের ভেতর আবদ্ধ টম রীডলের থেকে সে নিজে বেশি শক্তিশালী।

আমরা ভাষা দ্বারা চিন্তা করি ও ভাষার জগতে আবদ্ধ, কিন্তু ভাষা নতুনত্বের জন্ম দেয় – তাহলে ভাষা আবদ্ধতা ও নতুনত্বের দোলাচল একত্রে বহন করে। মিশেল ফুকো 'The Order of Discourse' শুরু করছেন এই বলে যে তিনি কথা বলতে এসেছেন, তাঁর ভেতরে একটি স্বর আসছে, এই স্বর হল ডিসকোর্সের স্বর। তিনি বলেন যে, প্রতিষ্ঠান ডিসকোর্সের মধ্যে উদ্বেগ বা ভীতি তৈরি করে, সেকারণে Order of Discourse বুঝতে গেলে order of law-কে বুঝতে হবে – যাতে কিনা স্পষ্ট হয় কি কি ভাবে এই উদ্বেগ বা ভীতি তৈরি হয় ও ক্রিয়া করে চলে। ডিসকোর্স বা সন্দর্ভ সভ্যতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত নানাভাবে। একারণে ডিসকোর্স একটি বিপদজনক জিনিস আবার তা নিজেই একটি 'object of desire', লোকে ডিসকোর্স তৈরি করতে ভালবাসে। কি কি ভাবে ডিসকোর্স নিয়ন্ত্রিত তাই নিয়ে কথা বলে ফুকোর এই প্রবন্ধটি। যেমন যুক্তি বনাম পাগলামি – একটা সময় পর্যন্ত পাগলামির স্বরকে সামনে আসতে দেওয়া হত না, সেই স্বর ছিল প্রান্তিক কিংবা স্তব্ধ কিংবা উপেক্ষিত, আধুনিক যুগে মনোবিদরা এদের কথা শুনছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই স্বর আগেও ছিল নিয়ন্ত্রিত এবং এখনও নিয়ন্ত্রিত। এরপর ফুকো বলছেন এক একটা যুগে সত্যের এক একটা ধরনের কথা – প্রত্যেক যুগে সত্যের যে ধরণ থাকে তার সাথে মিল না থাকলে তাহলেই ভুল এবং এটি অনেকভাবে কাজ করে। একটি সত্য শুধু আরেকটি সত্যকে গ্রহণ করাই নয় বরং আরও অন্য সত্যের সাথে বচসা করতে বলে। বিভিন্ন সময়

একটি ডিসকোর্স অন্য একটির সাথে আপোষ করে, ছেদ টানে ও একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে - এজন্য ডিসকোর্সকে আলাদা অনুশীলন হিসেবে দেখতে হবে। ডিসকোর্সের কোন অর্ডার থাকে না তা আরোপিত হয় – যাতে কিনা একটা বিষয় যেভাবে ঘটে ও যেভাবে তাকে সামনে আনা হয় তাতে এর আসল মূল্য হারিয়ে যায়। সুতরাং ডিসকোর্সের মূলে কি আছে এই তদন্তের দরকার নেই বরং ডিসকোর্স যেই সম্ভবনাগুলোর জন্ম দিচ্ছে সেগুলির দিকে ধাবিত হওয়ার কথা ফুকো বলেছেন।

'What is an Author'-এ দেখতে পাই ফুকো এগোচ্ছেন কোন সমাজে অথর কিভাবে ব্যক্তিতায়িত হয়ে এসেছে সেই প্রসঙ্গ ধরে এবং ক্রমশ তিনি অথরের ব্যক্তিতায়িত হওয়ার প্রক্রিয়াগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। ফুকোর মতে অথর বলতে বোঝায় এমন একজন মানুষের ধারণা যার ওপর কোনো রচনার ভার বৈধভাবে আরোপ করা যায়। এই প্রবন্ধে ফুকো author function-এর সাথে founders of discursivity-কে পৃথকীকরণ করেছেন।

সমাজে বৈধ-অবৈধ, ধর্মীয়-বিধর্মীয় প্রভৃতি দ্বিপ্রান্তিকতা আছে একদিকে - লেখার ক্রিয়া এই দ্বিপ্রান্তের মধ্যে ঘটে। আবার এই দ্বিপ্রান্ত নিয়ন্ত্রনের মতাদর্শও আছে। অথরকে সামনে রেখে এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। সেকারনেই পাঠের সাথে তার মালিকানা নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। বার্থ অথরের ধারণাকে বাতিল করে পাঠের সাথে পাঠকের সংযুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু অথরকে মুক্ত করা সহজে সম্ভব হয় না। অথরের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক শর্তাধীন – অথর হিসেবে যেই নাম সংযুক্ত হয় তা আর পাঁচটা সাধারণ নামের মতো না, অথর হিসেবে যেই নাম যোগ হয় তার ওপর ক্ষমতা আরোপ করা হয় এবং প্রয়োজনে অথরকে দণ্ডপ্রাপ্ত করা হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে রচনার ক্রিয়ার সাথে আইন অমান্য

করার বিষয়টা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল। ফুকো এটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় এই ব্যক্তিতায়িত করার প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন ভাবে কাজ করে এবং সাহিত্যের সাথে বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতির অথরের ধারণাও একভাবে কাজ করেনি। বিভিন্ন সময় অথর ফাংশন বদলে যায়, যেমন করে প্রত্যেক যুগে সত্য এক থাকে না। হোমার, বাল্মীকি, ব্যাস এনারা যে সময় লিখে গেছেন সেসময় অথরের নাম না থাকলেও চলত এগুলির প্রাচীনতার কথা ভেবে। আরেকটি কথা ফুকো বলেননি কিন্তু বিষয়টি ভাবা জরুরি, বাল্মীকি বা ব্যাস বা হোমার এনারা যে ধরণের রচনা করে গেছেন তাতে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিজীবন নিয়ে লেখেননি এবং যা কিছু লিখেছেন তা বোঝার জন্য তাঁদের দরকার হওয়ার অবস্থাই তৈরি হয়নি (অথরের ধারণা যে অনেক পরে এসেছে এটা বার্থ ও ফুকো দুজনেই মানছেন)। ভেবে দেখলেই বোঝা যায় বাল্মিকী ছিলেন ডাকাত, চাইলে নিজের জীবন নিয়েই একটি মহাকাব্য লিখতে পারতেন, কিন্তু লিখলেন না। ব্যাস মহাভারতে সর্বত্র থেকেও নেই। হোমারের জীবন কেউ জানেনা। কিন্তু ইলিয়াড ও ওডিসিতে তিনি নিজের জীবন নিয়ে কিছুই বলেননি। এর থেকে একটা কথা বোঝা যায় যে মহাকব্যের কবিরা কখনও নিজে হিরো হতে চায়না। তারা দেখিয়ে দেয় দেখো হিরো এইরকম বা এইরকম হলে ভাল হয়। যা আজ আর আমরা কেউ ভাবতে পারিনা। এছাড়া অথরের সমগ্র সাহিত্যকর্ম অন্তরভুক্ত করার ক্ষেত্রেও অনেকগুলি জটীলতা কাজ করে। অথরকে এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা হয়। অথর পুনর্গঠিত হয়। রচনাতে সবসময় কিছু চিহ্ন থাকে যেগুলি নির্দেশ করে রচয়িতাকে। তবে এটিও নেহাত স্বচ্ছ পদ্ধতি নয়। অথর ফাংশন কোনো একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে

না, কারণ তাতে বহু ব্যক্তির বহু বা বহু বিষয়ীর উপস্থিতি বিবিধ অবস্থার উদ্ভব ঘটাতে পারে যা আবার বিভিন্ন ব্যক্তিরা অধিকার করে থাকে।

'Founders of discursivity' বলতে ফুকো আরেক ধরনের অথরের কথা বলেছেন যারা কিনা উপরিউক্ত অথর-দের থেকে আলাদা। এই শ্রেণীভুক্ত অথরেরা শুধু তাঁদের নিজেদের কাজেরই অথর না, তাঁরা অন্যদের টেক্সটের সম্ভবনা ও নিয়ম উত্থাপন করেছেন। এনারা ডিসকোর্সের অনন্ত সম্ভবনা তৈরি করতে পেরেছেন। তাই এঁদের ভূমিকা নভেলিস্টদের থেকে অনেক আলাদা। ফ্রয়েড ও মার্ক্সকে তিনি এই শ্রেণিভুক্ত করেন। একজন ঔপন্যাসিক বড়জোর তাঁর নিজের টেক্সট-এর রচয়িতা কিন্তু ফ্রয়েড কেবলমাত্র *The Interpretation of Dreams*-এর অথর না কিংবা মার্ক্স কেবল *Communist Manifesto*'র অথর না, তাঁরা উভয়ই প্রতিষ্ঠা করেছেন রচনাধারার অনন্ত সম্ভবনাকে। ডিসকোর্সের অনন্ত সম্প্রসারিত হওয়ার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রয়েছে ফ্রয়েড ও মার্ক্সের লেখায়।

তবে প্রবন্ধের শেষে এসে ফুকো বলেছেন যে একটা সময় এমন আসবে যখন কোনো অথর থাকবে না। ফুকো এখানে অথর কি কি ভাবে হয় তার একটা শ্রেণীকরণ করেছেন এবং সেটা করতে গিয়ে এটাও দেখিয়েছেন যে অথর আছে মানেই বিভিন্নভাবে পাঠ সংকুচিত। বার্থ অথরের না থাকার কথা বলেছেন, ফুকো তাঁর প্রবন্ধে অথরের ওপর নির্ভরতার পদ্ধতিগুলো তুলে ধরেছেন যাতে সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে অথরকে অপসারণের কথা ভাবা যায়।

এই অংশের শুরুতে কেন্দ্রবিমুখতা নিয়ে যে আলোচনা শুরু করা গিয়েছিল, বার্থ ও ফুকো দুজনের লেখাতেই সেই কেন্দ্রবিমুখতার স্বরই প্রকট হয়েছে। তবুও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন অটোবায়োগ্রাফি

বা আত্মজীবনীতে 'truth claim'/ সত্যের দাবী থাকে, তাহলে কেন্দ্র কি পুরোপুরি অপসারিত হয়ে যাচ্ছে? নাকি ছায়ার মতো আমাদের ভাবিয়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্নের আলোচনাও কেন্দ্র বিরোধী হতে পারে; তবে তা আরেকটি আলোচনার দাবী রাখে।

৩.২ কর্তৃত্বের জটিলতা

মিখাইল বাখতিন ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'dialogic' ও 'monologic'-এর ধারণা দেন[53]। আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে যেহেতু লেখকের অভিজ্ঞতার বর্ণনাই সত্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাই লেখকের অথরিটি বা কর্তৃত্ব তৈরি হয় টেক্সটের ওপর। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক অনুশীলন, আত্ম-র সাথে সমাজ, প্রকৃতি প্রভৃতির কথোপকথন টেক্সটগুলিকে আবার 'dialogic' করে তোলে। সুতরাং আত্মজীবনীতে অথরের মনোলগ ও অভিব্যক্তির মধ্যে একরকমের উত্তেজনা কাজ করে। (যদিও বা যেকোনো টেক্সটই dialogic) অথরের অথরিটি আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে কিভাবে জটিলতা তৈরি করে এই প্রসঙ্গটি এই অংশে আলোচনায় আনা হবে।

পল ডি মান তাঁর 'Autobiography as De-facement'[54] প্রবন্ধে বলেন যে আত্মজীবনীর তাত্ত্বিক ক্ষেত্র কিছু পুনরাবৃত্তিকর প্রশ্ন ও অভিগমন দ্বারা জর্জরিত। সেই প্রশ্নগুলিতে কষ্টকল্পনা ও বিচ্যুতির লক্ষণ দেখা যায়, যা কিছু ধারণার দ্বারা আবদ্ধ এবং সমস্যাসঙ্কুল। এর মধ্যে একটি সমস্যা হল

---

[53] Mikhail Mikhailovich Bakhtin, *The Dialogic Imagination*, (University of Texas Press Austin and London, 1981).

[54] Paul De Man, "Autobiography as De-facement", in *The Routledge Auto/Biography Reader*, ed. Ricia Anne and Emily Hipchen, (Routledge, 2016), 31-33.

আত্মজীবনীকে অন্যান্য সাহিত্যিক জঁর-গুলির মধ্যে একটি জঁর হিসেবে নির্ধারণ করা। যেহেতু এই জঁরের ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় নান্দনিকতার পাশাপাশি ঐতিহাসিক ক্রিয়া হিসেবে, তাই এর ক্ষেত্র সঙ্কটাপন্ন। কারণ জঁরটি আত্মজীবনীর অথরের অভিজ্ঞতার আশ্রয়কেই শুধুমাত্র বহন করে না, বরং নান্দনিকতা ও ইতিহাসের সম্ভাব্য অভিসরণকেও সূচিত করে। আত্মজীবনীকে একটি সাহিত্যিক জঁর হিসাবে নির্ধারণ করে এটিকে নিছকই তথ্য-কাহিনীর ধারাবিবরণীর পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু এতে ট্র্যাজেডি, এপিক, লিরিক প্রভৃতির মতো সমমান আত্মজীবনী পায় না, যেহেতু এটি একভাবে স্ব-প্রণোদিত লক্ষণাত্মক (যদিও বা পল ডি মানের এই কথাটি গ্রহণীয় নয়, কারণ স্ব-প্রণোদনা যেকোনো টেক্সট-এর ক্ষেত্রেই লক্ষিত হয়।)। তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আঠারো শতকের আগে কি আত্মজীবনী সম্ভব ছিল নাকি তা প্রাক-রোম্যান্টিক অথবা রোম্যান্টিক প্রপঞ্চ? সেন্ট আগাস্টাইন কিংবা রুশো প্রমুখদের আত্মজীবনীর কথা মাথায় রেখে তিনি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এছাড়াও তিনি বলেন আত্মজীবনী পদ্যে লেখা যায় কিনা; কারণ তা না হলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর *The Prelude*-কে আত্মজীবনী বলা যায় না। এরসঙ্গে তিনি এই বিশেষ দিকটির দিকেও নজর দেন যে একেকটি আত্মজীবনী একেকভাবে অন্যান্য সাহিত্যিক জঁর-গুলির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও বহন করে। এ সত্ত্বেও আত্মজীবনীর আরেকটি বড় দিক হল – ফিকশনের সঙ্গে এর পার্থক্য। একদিকে এই জঁর-টি ব্যক্তির বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাক্রমের ওপর নির্ভরশীল, অন্যদিকে ফিকশন এদিক থেকে মুক্ত। কিন্তু তিনি এই প্রশ্নও করেছেন যে এতোটাই কি নিশ্চিত হওয়া যায় যে আত্মজীবনী বাস্তবের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল? সুতরাং এটাই সামনে আসে যে ফিকশন ও আত্মজীবনী দুটি মেরু নয়, এদের মধ্যেকার সীমারেখা মীমাংসা করা যায় না। আমরা ধারণা

করি যে জীবন-ই সৃষ্টি করে আত্মজীবনী, যেভাবে একটি ক্রিয়া জন্ম দেয় তার ফলাফলকে। কিন্তু এটাও কি ভাবা যায় না যে আত্মজীবনীর প্রকল্প নিজেই সৃষ্টি ও নির্ধারণ করে কিভাবে একজন লেখক তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি নিজের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরবে? অর্থাৎ লেখকদের জীবন অভিজ্ঞতার প্রকাশই আত্মজীবনী জঁর-টি গঠন করায়? নাকি প্রায় দু-শতকের বেশি সময় ধরে জঁর-টির যেসব বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে সেগুলিই এখনও লেখকের প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে? – প্রায় এরকমই কয়েকটি প্রশ্ন পল ডি মান 'Autobiography as De-facement' প্রবন্ধে করেছেন। এই সংশয় আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে আত্মজীবনী পাঠের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ডি মান বলেন, আত্মজীবনী তাহলে একটি জঁর বা মোড নয় বরং এটি একটি পাঠের বা টেক্সটকে অনুধাবন করার বিশেষ ধরণ যা যেকোনো টেক্সট-এর ক্ষেত্রেই সম্ভব। লেখক ও পাঠক পরস্পরের আদানপ্রদানের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে লেখনী ও পাঠ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে।

নির্দিষ্ট একটি/ একাধিক টেক্সটকে আত্মজীবনী হিসেবে চিহ্নিত করার ভূমিকা সেই টেক্সট'এর লেখকের নিজের হাতেই থাকে। লেখকের উল্লেখই পাঠকের সচেতনতাকে আক্রান্ত করে যে সেটি লেখকের জীবনের গল্প। আর বাকি রচনায় বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করার দায় নেই, কিন্তু আত্মজীবনীতে (যেন) সত্যের দাবী রাখতে পারে পাঠক। এভাবে লেখনীর ক্রিয়ার মাধ্যমে পাঠকের সাথে লেখকের চুক্তি তৈরি হয় প্রথম থেকেই – লেখকের এক কল্পমূর্তির অস্তিত্ব 'অথর' হয়ে ভাবাতে থাকে পাঠককে। আত্মজীবনীতে লেখকের সাথে পাঠকের এই চুক্তি পাঠ প্রক্রিয়ায় জন-মনস্তত্ত্বের (mass psychology) বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পল ডি মান বলেন যে আত্মজীবনীর লেখকেরা চৈতন্য থেকে

বিশ্লেষণ ও ক্রিয়া এবং দূরকল্পনা থেকে রাজনৈতিক ও বৈধ অথরিটির দিকে ঝোঁকার প্রতি মোহাবিষ্ট – যা ঘটে থাকে অথরের স্বাক্ষরের দ্বারা।

জাঁক দেরিদা 'Otobiography: The Ear of the Other'[55] নামক বক্তৃতায় নীটশে-র *Ecce Homo* নামক আত্মজীবনী নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন জীবনী ও আত্মজীবনীর 'আত্ম' পুনর-মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে চলেছে। তিনি বলেন যে আমরা এখন আর একজন দার্শনিকের জীবনীকে অভিজ্ঞতাবাদী আকস্মিক ঘটনা বলে বিবেচনা করি না। আত্মজীবনী একটা নাম ও একটা স্বাক্ষর দুইই ছেড়ে যায় ও প্রদান করে একটি অন্তর্নিহিত দার্শনিক পাঠ যা কিনা দার্শনিক ভাবে বৈধ। এই বিদ্যায়তনিক ধারণা নিতান্তই উপেক্ষা করে একটা টেক্সট-এর দাবীকে এবং এটি নিয়ন্ত্রণ করে ও ঐতিহ্যগত ভাবে নির্ধারণ করে লিখনের সীমাকে এমনকি প্রকাশনাকেও। এর সীমাকে স্বীকার করে অন্যদিকে কেউ কেউ লেখা শুরু করেন দার্শনিকদের জীবনীকে। এই জীবনীমূলক উপন্যাসগুলো বা মনস্তাত্ত্বিক জীবনীগুলো দাবী করে দার্শনিক পদ্ধতির মধ্যে মনঃসমীক্ষণ, ঐতিহাসিক কিংবা সমাজভাষার ধরণকে। দেরিদা এতে না বলবেন কারণ জীবনীমূলক লেখা সাধারণভাবে নাম ও স্বাক্ষরকে নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে। অভিজ্ঞতাবাদী পাঠগুলি প্রশ্ন করে ক্রিয়া/ টেক্সট ও জীবনের মধ্যেকার সীমারেখাকে। এর মধ্যে আছে একটি সিস্টেম বা পদ্ধতি ও পদ্ধতির বিষয়ী নিজে এবং তার সঙ্গে ক্ষমতার জোর।

দেরিদা বলেন একটা নামকে সামনে রাখা মানে আমরা ধরে নিতেই পারি যে একজন মৃতের নামকে সামনে রাখা হয়েছে। যা কিছু নামের সঙ্গে ফিরে আসবে তা কখনই জীবিতের ওপর ফিরে আসবে

---

[55] Jacques Derrida, *The Ear of the Other*, (Nebraska, 1988), 1-38.

না। দেরিদা তাই নীটশে-কে দার্শনিক কিংবা পণ্ডিত কিংবা বৈজ্ঞানিক হিসেবে পড়তে চাননি। তিনি টেক্সট-এর মধ্যে কি বলা হয়েছে তার প্রতিই নজর দিয়েছেন। দেরিদা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দিয়েছেন, তা হল 'ফ্রেডরিক নীটশে' স্বাক্ষরের মাধ্যমে একটা গোপন চুক্তি রয়ে যায়। কিন্তু যা কিছু নামের সাথে ফিরে আসবে তা একটি জীবিত নয় মৃত নামের প্রতিই ফিরে আসবে – এই বিষয়টির ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। এই স্বাক্ষরই শোনায় যে ব্যক্তিটি কিরকম আর সে কিরকম ভাবে আর অন্য কোনোরকম নয়। সে নিজেকে বোঝাতে চায় 'অপর'এর কাছে। স্বাক্ষরের মাধ্যমে 'অথর' মৃত্যুকে কবর দেন এবং সেইসঙ্গেই জীবন ও অমরত্ব বেঁচে ওঠে। পাঠক বা শ্রোতার কানের দ্বারা/ শ্রবণের দ্বারা/ পাঠের দ্বারা এই অমরত্ব তৈরি হয়। এই কান সর্বদাই অপরের কান।

Roland Barthes by Roland Barthes-এ[56] বার্থ শুরুতেই বলেছেন যে এই টেক্সটটিকে যেন কোনো নভেলে চরিত্রের কথন হিসেবেই দেখা হয়। এই আবেদনটি বার্থ করেছেন পাঠকের কাছে। কিন্তু এর মধ্যেই এই বীজ লুকিয়ে রয়েছে যে তিনি তাঁর নিজের কথা বলতে চেয়েছেন, যার 'আমিত্ব' যে কোনো চরিত্রের কথন হতে পারে। যেন একটি চরিত্রই বার্থের সম্পর্কে বলছে এবং এখানে চরিত্রটি ও বার্থ একে অপরের কাছে অপর। বার্থ যেন নিজের জীবনী একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন। তাঁর নিজের মধ্যে 'অথর'কে খারিজ করার যে ধারণা তা তিনি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন নিজের লেখনীর মধ্য দিয়ে।

---

[56] Roland Barthes, *Roland Barthes by Roland Barthes*, (Hill and Wang, 2010), 2-3.

টেক্সটটির শুরুতে বলা হচ্ছে কিছু ফটোগ্রাফির কথা যেগুলো অন্য কোনো ব্যক্তি যেন বলছে যে সেগুলো বইটি শেষ করার জন্য অথরের নিজের আয়োজন। তাঁর আনন্দ একটি আকর্ষণের বিষয়। এবং এখানে আবার উত্তম পুরুষ বলে ওঠে যে সে যেই ফটোগ্রাফগুলো রেখেছে সেগুলি তাঁর আকর্ষণ অনুযায়ী এবং কেন ভালোলাগে তার কারণ না জেনেই। তবে ফটোগ্রাফগুলো কল্পনা ছাড়া এখন আর কিছুই না। এইখানেই সত্তার একটি যুগ্ম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উত্তম পুরুষের কণ্ঠে বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র যৌবনের আনন্দের ছবিগুলিই বার্থের ভালোলাগে। সুতরাং এখানে বিষয়টি শুধুই নস্টালজিয়া নয় বরং সেই অপেক্ষা বেশি কিছু। টেক্সটটি বার্থের শিক্ষানীতি/ pedagogy (টেক্সটটিই বলতে বলতে যায় যে কিভাবে এটি পড়তে হবে) এবং নিজেকে তিনি গোচরে আনতে চান না। তাঁর সুখসাধনা/ আনন্দবাদ/ hedonism একটা অনুসন্ধিৎসা, তা নস্টালজিয়া নয়। লিখন ও পঠন ক্রিয়া এই আনন্দবাদের প্রতীক। আর তিনি বারবার করে নিজেকে অশনাক্ত রাখতে চান। ফটোগ্রাফগুলো যেন বিচ্ছিন্ন সত্তা এবং কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ আনন্দের বস্তু। এগুলো এখন আর ব্যক্তিগত পরিচয়ের কোনো প্রতিফলন নয় এবং এর ভূমিকা স্বপ্নকল্প (‘oneiric’) হিসেবেই। এগুলো পাঠকদের দৃষ্টির দ্বারা আবদ্ধ ও বার্থের নিজের সাথে শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক বহির্ভূত। অর্থাৎ বলতে চাইছেন ফটোগ্রাফগুলি নির্দিষ্ট কোনো সময়ের ছাপ ছাড়া আর কিছু বহন করে না, এর কোনো শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন নেই, নড়ন-চড়ন নেই, সরণ-প্রতিসরণ নেই, কিন্তু জৈবিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ছবিগুলি মাতাপিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে আলিঙ্গন করে রয়েছে এবং এগুলি শারীরিক চিহ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন মাধ্যম যা নির্বোধ স্বপ্নের মতো লেখককে বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত করছে লেখকের সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য দ্বারা। এগুলি লেখকের অন্তর্গত নয়, নয় অন্যকারোরও। লেখক এর

মধ্যে একটি ফাটল বা ‘fissure’ দেখতে পান। তবে বার্থের লেখায় ধরা পড়ে উভবলতা। তিনি বলেন একভাবে এই ফোটোগ্রাফগুলি ভীষণই অসমীচীন কারণ এগুলি তাঁকে উপস্থাপন করে, এবং অন্যদিকে এগুলি সমীচীনও বটে কারণ ফটোগ্রাফগুলি ‘রঁলা বার্থ’ নয়। শুধুমাত্র শরীরের প্রাক-ইতিহাস এতে পাওয়া যায়। সুতরাং এগুলির ভূমিকা সীমাবদ্ধ। তবে এগুলি যে অথরের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে তার ভার কিন্তু তিনি পুরোপুরি এড়াতে পারছেন না। এখানে বার্থের বক্তব্যে দ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়।

বার্থ বলেছেন যে তিনি যখন লেখেন তখন টেক্সট নিজেই তার ধারাবাহিকতা থেকে তাঁকে অধিকারচ্যুত করে। তিনি প্রথমেই লেখার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চান এবং এই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার বোধ ও পদ্ধতিকে তিনি সৃজনশীল হিসেবে দেখেছেন। যখনই সৃজনশীল জীবন আসছে তখন দৃশ্যের সংরক্ষণাগার বন্ধ হয়ে যায়। টেক্সট-এর যাত্রা শুরু হয়, সেটা আরেকরকমের সংরক্ষণাগার। টেক্সট শুরু হলে ফটোগ্রাফগুলি ছাড়াই টেক্সট চলতে পারে। এর প্রদর্শন কখনোই শেষ হবে না, বৈধতার প্রয়োজন নেই, কোনও একজন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার প্রয়োজন নেই। টেক্সট হয়ে থাকে লেখকের প্রতিনিধি। লেখা ছাড়া আর কিছু নেই। প্রকৃত ব্যক্তির বদলে এক মরীচিকার সম্মুখীন হয় পাঠক। শুধু যার হাত লিখছে তাঁর ছাপ থেকে যায়। তবে এখানেও কিন্তু নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারছেন না। ব্যক্তিগত ছোঁয়া থেকেই যাচ্ছে। তাছাড়া টেক্সটটির নামকরণের মধ্যেই আছে একরকমের জটিলতা। বার্থ বুঝিয়ে দিতে চান তাঁর টেক্সটটি কিভাবে পড়া উচিত বা পড়তে হবে – এর মধ্যেই তো সুপ্ত থেকে যাচ্ছে কর্তৃত্বের মানসিকতা। আর লেখক হয়ে থাকতে চান নিজের জীবনের কর্তৃত্ব বহনকারী।

সুতরাং এতক্ষণের আলোচনায় দেখতে পাই কেন্দ্র হিসেবে 'অথর'কে পর্যুদস্ত করার পর, আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে সে আবার পরাক্রমশালী হয়ে উঠছে। তাঁর পুরোপুরি অপসারণ হচ্ছে না। কারণ এইক্ষেত্রে সমস্যাটি হল Ontological, যা আত্মজীবনীর পাঠে পাঠক ও 'অথর'এর সম্পর্ককে চুক্তিতে বেঁধে ফেলে।

৩.৩ আত্মজীবনী লেখার ভূমিকায় মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের মতামত

'কবিতার জীবন ও দুষ্প্রবেশ্যতা'[57] নামক প্রবন্ধে মনীন্দ্র গুপ্ত লেখক, পাঠ ও পাঠকের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যা এই অংশে উপস্থিত হবার দাবী রাখে। তিনি বলেছেন 'সব কবিতা সব অবস্থায় সকলের অধিগম্য নয়।' এজন্য পাঠক বা কবি কেউই দোষী নন। কবি হয়তো পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের কথা সততা নিয়েই মাথায় রেখেছিলেন এবং পাঠকও হয়তো তাঁর উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলন নিয়ে প্রস্তুত – কিন্তু তাও কবি ও পাঠকের 'আকাঙ্ক্ষিত সাযুজ্য' সবসময় ঘটে না। তার কারণ তিনি বলেছেন যে কবিতা অঙ্কের মতো যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে নির্মিত হয় না। কবিতা একটি জীবিত প্রক্রিয়ার ফল এবং নিজেও ভয়ঙ্কর ভাবে জীবিত। এখানেই চলে আসে পাঠের গুরুত্ব – যেহেতু কবিতা জীবন্ত তাই তার ভঙ্গির ও গঠনের বিচিত্র উন্মেষের শেষ নেই।

জন্মের প্রক্রিয়া যেমন গর্ভে, দৃশ্যের আড়ালে হয়ে থাকে কবিতার জন্মও সেরকম ভাবে কবির মানসক্ষেত্রে কল্পবাস হওয়ার ফলস্বরূপ ঘটে থাকে। প্রাণীজগতের জন্ম ইন্দ্রিয়গম্য কিন্তু কবিতার জন্ম

[57] মনীন্দ্র গুপ্ত, "কবিতার জীবন ও দুষ্প্রবেশ্যতা", *গদ্যসংগ্রহ ১*, (অবভাস, ২০১৩), ৩-২১.

ইন্দ্রিয়াতীত। সুতরাং কবির মনই হল কবিতার জন্মক্ষেত্র। আর কবিতার বীজ প্রাথমিক অবস্থায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যা কিনা পরমুহূর্তেই স্মৃতি। এই স্মৃতি কবির এক অপ্রত্যক্ষ, নিজস্ব জগতে বাস করে কাগজস্থ হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও তার স্মৃতিই মূলত কবিতার বীজ। কিন্তু স্মৃতি হওয়ামাত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রত্যক্ষতা হারিয়ে অন্যরকম হয়ে যায়। অর্থাৎ তিনি স্বীকার করছেন মানসলোকে যাপন করে স্মৃতির আকার ক্রমাগত বদলে যায়। এই স্মৃতির গতি-প্রকৃতি বদল শুধু কবিতা কেন, আমরা ধরে নিতে পারি যে কোনো সৃজনশীল লেখার ক্ষেত্রেই সত্যি।

কিন্তু মনীন্দ্র গুপ্ত বলেন যে অভিজ্ঞতা আসে না বরং জগত জীবনে বাস করে ও অহমের আঘাতে প্রতিঘাতে অভিজ্ঞতার জন্ম হয়। একটা অভিজ্ঞতা পরবর্তী অভিজ্ঞতার জন্মকারণ হয়। এভাবেই অভিজ্ঞতার শৃঙ্খল দীর্ঘ হয় এবং একটিতে আঁচ এলে অন্যগুলি শব্দ করে ওঠে। আর এই শৃঙ্খলের সূত্রেই একজন কবির সমস্ত কবিতার মধ্যে একরকম সংলগ্নতা পরিলক্ষিত হয়। আপাতভাবে স্ববিরোধ বা বৈপরীত্য থাকলেও নিহিত একটা বিশেষ চরিত্র অনুভূত হয়; যার সূত্রে কবির সমগ্রতাকে বুঝতে সুবিধা হয়। মানে বোঝাই যায় যে তিনি প্রত্যেক রচনার সময়কালগুলিকেও সমান ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন কবিতা ও কবিকে বোঝার জন্য।

প্রত্যেকের অহমের বোধ ও সেইসঙ্গে অভিজ্ঞতা ভিন্ন হওয়ায় একজন মানুষ অন্যজনের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এভাবেই একজন মানুষ অন্যজনের কাছে অপরিচিত হয়। দুষ্প্রবেশ্যতা ও দূরত্ব মানুষের ক্ষেত্রে যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি সৃজনশীলতার ক্ষেত্রেও। এই 'দুষ্প্রবেশ্যতা' বিষয়টি উত্তর আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভিজ্ঞতা সমপর্যায়ের না হলে থেকে যায় শিল্পের অর্থ গ্রহণে অনধিকার।

আর বলাই বাহুল্য যে অভিজ্ঞতা সমপর্যায়ের হয় না; কারণ লেখকের 'অভিজ্ঞতার বীজ' ও পাঠকের অভিজ্ঞতার বীজ এক হয়না।

মনীন্দ্র গুপ্ত পাঠের ক্রিয়াটিতেও বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন, এটিও তাঁর চিন্তনে উত্তরাধুনিকতার বড় দিক। তিনি বলেন যে কাগজে ছেপে প্রকাশিত হওয়ার পর কবিতার একটা শব্দও বাড়ে না বা কমে না, কোনোরকম দৈহিক পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু কাগজের ছাপা লেখা পাঠকের বোধে কিছু একটা সঞ্চারিত করে। কারণ কবিতা (বা যেকোনো শিল্প) সংক্রামক। এই সংক্রামক হওয়ার ক্ষমতাই যে কোনো কবিতা বা যে কোনো অন্য জঁরের লেখা বা শিল্পের প্রাণময়তার প্রমাণ। অর্থাৎ কবিতা বনাম শিল্পকে লেখক সর্বদা ক্রিয়াশীল বস্তু হিসেবেই দেখছেন, যা ঘটে থাকে পাঠক/ দর্শক/ শ্রোতার সক্রিয় যোগদানের দ্বারা। কবির সংহত চেতনা পাঠকের চেতনার আকাশে ব্যাপ্তি পায়। পাঠক না থাকলে একটা টেক্সটের গতি রুদ্ধ থাকত। তবে একজন পাঠকের কাছে রচয়িতার সংহত চেতনা অখণ্ড সম্পূর্ণতায় প্রকাশ পায় না। এর কারণ আবারও 'দুষ্প্রবেশ্যতা', যা কোনো পাঠকই কখনও এড়াতে পারবেন না। পরিশেষে মনীন্দ্র গুপ্ত প্রশ্ন তোলেন একদিকে রচয়িতা চান নিজেকে উন্মীলিত করতে, অন্যদিকে টেক্সট ও পাঠকের সংযোগে থেকে যায় রচয়িতার অভিজ্ঞতার বীজে দুষ্প্রবেশ্যতা। তাহলে রচয়িতা কি চান "গোপন করতে, না, গহন করতে?" এই দার্শনিক প্রশ্নটি প্রশ্ন আকারেই থেকে যায়, সুরাহা হয় না।

'আত্মজীবনী'[58] নামক প্রবন্ধে মনীন্দ্র গুপ্ত বলেন যে নিজের জীবনটিকে জনসমক্ষে আনার কতগুলো বাস্তব সমস্যা আছে, যা তাঁর সমাজ তাঁকে ভাবতে বাধ্য করায়। অর্থাৎ সমাজ বা পাঠকের

---

[58] মনীন্দ্র গুপ্ত, "আত্মজীবনী", *গদ্যসংগ্রহ ১,* (অবভাস, ২০১৩), ২১৭-২১৯.

'horizon of expectations' আত্মজীবনীর গঠনে ভূমিকা রাখে। তিনি বলেছেন "লোকচক্ষে যাতে হেয় না হই তাই আমরা আত্মদমন করি। হেয় হয়ে, যাতে লোকের মুখোমুখি হতে না হয় তাই আত্মহত্যাও করি। আত্মদমন মানে জীবনের স্পৃহাকে এগিয়ে যেতে না দেওয়া, বাসনাকে রুখে দেওয়া। আত্মহত্যা মানে নিজেকে পুরো লুকিয়ে ফেলা। যে ভয়ে মানুষ আত্মদমন ও আত্মহত্যা করে সেই ভয়েই আত্মজীবনীকার তাঁর কাহিনী থেকে কোনো কোনো ঘটনা, কিছু কিছু অনুভূতি এবং রেভিলেশন বেমালুম চেপে যান বা গায়েব করে দেন। সত্যি-জীবনকে লুকিয়ে ফেলা আর স্মৃতি-জীবনের ঘটনা গায়েব করা – ব্যাপারটা তো একই।" কিন্তু তিনি এও বলেন যে জীবন যতই মহৎ বা বিচিত্র হোক সত্য বৃত্তান্ত না জানালে আত্মজীবনীর মূল্য থাকে না। অর্ধসত্য বা আচ্ছাদিত সত্য বললে কাহিনী মেঘলা, ময়লা, কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে সত্যি কথা বলার দায় জীবনীকারদের চেয়ে আত্মজীবনীকারদের অনেক বেশি এমনটাই তিনি বলেছেন। কারণ যার আত্মজীবনী সে নিজে নিজের জীবনটাকে সবচেয়ে বেশি চেনে।

পাঠকদের মেনে নিতে পারার ক্ষমতাকে মাথায় রেখে তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আত্মজীবনীর কি তবে দুরকম সংস্করণ হবে? একটা নিরাবরণ সত্য অন্যটা যতটা সয় মাত্র ততটাই? তারপর তিনি বলেছেন আসলে সত্য কথা বলার জন্য যেই গুণটি চাই তা হল 'দীনতা'। বোঝাই যাচ্ছে আত্মজীবনী লেখার ক্ষেত্রে তিনি সত্যের মূল্যকে স্বীকার করছেন এবং স্বীকারোক্তির স্বর তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল।

'আত্মজীবনী লেখার সংকট'[59] রচনাটি *চিত্রক চতুর্মাসিক কবিতাপত্রিকা* আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রেক্ষাগৃহে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯৮ সালে *অক্ষয় মালবেরি*র দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ অনুষ্ঠানে পড়া হয়। সেখানে তিনি স্মৃতির উল্লেখ করে বলেছেন যে তাঁর আত্মজীবনী এক অর্থে জাদুকর স্মৃতির সন্ধ্যায় একলা বসে রোমন্থন। এখানেও তিনি একই কথা বলেন, যে যদি আত্মকথা লিখতেই হয় তবে নিজের কানাকড়ির জীবনটিকেই মেলে ধরতে হবে, পরতে পরতে খুলতে হবে নিজের চেতনা। এবং এই কথা মনে রেখে তিনি চেষ্টা করেছেন নিজের জীবনকে না লোকাতে। কিন্তু তিনি এও স্বীকার করেন যে লেখার পর তিনি বুঝতে পেরেছেন সম্যক সত্যের নিজস্ব যে ভাষা তা হয়তো তিনি খুঁজে পাননি। এখানেই একদিকে আছে সত্য বলার দায়, অন্যদিকে ভাষায় সত্যকে ছুঁতে না পারার অক্ষমতা।

মনীন্দ্র গুপ্ত তাঁর আত্মজীবনীর সঙ্গে ইলাসট্রেশন যুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন মূলত লেখক। পরিতোষ সেন মনীন্দ্র গুপ্তের মতো আত্মজীবনী লেখার সমস্যা ও ধারণা নিয়ে এতকিছু বলেননি ঠিকই। কিন্তু পরিতোষ সেন যেহেতু আগে শিল্পী পরে লেখক তাই তাঁর লেখনী থেকে আত্মজীবনী সম্পর্কে সরাসরি বক্তব্য না পাওয়া গেলেও তাঁর ছবির থেকে এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত/ সূত্র পাওয়া যেতে পারে। তাঁর করা আত্মপ্রতিকৃতিগুলির দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় বিভিন্ন ছবিতে তিনি নিজেকে নিয়ে মস্করাও করেছেন। কোনো প্রতিকৃতিতে তিনি মুখে পাইপ ধরে আছেন, কোথাও মুখমণ্ডলে অশেষ গাম্ভীর্য, কোথাও বা তিনি বসে আছেন একটি বাঁদরকে সঙ্গে করে, কোথাও দেখা যায় আর্টিস্ট ও মডেল একে অপরের মধ্যে বদলে গেছেন, কোথাও বা তিনি বৃদ্ধ বয়সেও চলন্ত বাসে থাকা নারীদের পেছনে ছুটছেন। দেবদত্ত

---

[59] মনীন্দ্র গুপ্ত, "আত্মজীবনী লেখার সংকট", *গদ্যসংগ্রহ ২*, (অবভাস, ২০১৬), ১৫০-১৫৩.

গুপ্তের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে দেবদত্ত গুপ্ত পরিতোষ সেনকে প্রশ্ন করেন যে "আপনার ছবিতে নানা ভাবে আপনি নিজেকে আনেন। এর কারণ কী?"[60] উত্তরে তিনি বলেন, "আত্ম প্রতিকৃতি বারে বারেই আঁকি কারণ নিজেকে দেখি। প্রতিদিনের পরিবর্তনগুলো আমাকে নাড়া দেয়। প্রতিদিন পাল্টে যাচ্ছি। নিজেকে নিয়ে মাঝে মাঝে এমন মস্করাও করি।" আত্মপ্রতিকৃতিও আত্মজীবনীর মতো নিজেকে জানান দেওয়ারই প্রক্রিয়া। এই নিজেকে জানানোর প্রক্রিয়ায় ছবিতে উঠে এসেছে নানান মনস্তাত্ত্বিক অতিরেক। কল্পনাটা ছবিতে অনেক বেশি। অদ্ভুত বিষয় এটাই যে এরকমটা আত্মজীবনী লেখার সময় তিনি করেননি। অথচ দুটোই আত্মপ্রকাশ। তাহলে লেখার ক্ষেত্রে কি সত্য বলবার দায় তাঁর মধ্যে কোথাও কাজ করেছিল? এই প্রশ্নটি আমরা অনুমান করেই নিতে পারি।

কবিপক্ষ পত্রিকার তরফে কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও সন্দীপ সরকার ওনাকে ছেলেবেলার কথা লিখতে অনুরোধ করলে তিনি আত্মজীবনী লেখার উদ্যোগ নেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে ছবি আঁকা ওনার অভ্যাস, সুতরাং তিনি শব্দ দিয়ে প্রতিকৃতি আঁকেন। এছাড়াও *জিন্দাবাহার*এর ভূমিকায় তিনি লেখেন, "লিখতে বসে, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে, স্মৃতিসৌধের অন্ধকার কোঠায় আবদ্ধ, ছোটোবেলাকার নানা কথা, নানা লোকজন, নানা অনুভব, এক অজানা সঞ্জীবনীর প্রক্রিয়ায় জীবাশ্ম পদার্থের নতুন প্রাণ পাওয়ার মতো, মিছিল ক'রে বেরিয়ে এল। প্রচলিত অর্থে স্মৃতিকথা লেখার প্রয়াসে ব্যর্থ হলাম। সাহিত্যিক ভানশীলতায় দুষ্ট হওয়ায় সেই লেখনী বাতিল করে দিতে হল।"[61] এই যে 'প্রচলিত অর্থে স্মৃতিকথা লেখার

---

[60] সেন, পরিতোষ. "পরিতোষ সেন". *র‍্যাডের কথাকাগজ.* অগ্রহায়ণ, ১৪১৫.

[61] পরিতোষ সেন, *জিন্দাবাহার,* (প্যাপিরাস, ১৯৭৯), ৯.

প্রয়াসে ব্যর্থ' হওয়া ও 'সাহিত্যিক ভানশীলতায় দুষ্ট' হওয়া এই দুইই প্রমাণ করে আত্মজীবনী জঁর-টির গঠন ও সত্যের দায় প্রমাণ করার ঐতিহাসিক ক্রিয়া, যা রচয়িতারা ভাবতে বাধ্য হন।

সুতরাং আগের অংশে উল্লেখ করা পল ডি মানের সন্দেহটিই টিকে রইল যে বহুদিন থেকে চলে আসা আত্মজীবনী জঁর'টির গঠন ও বৈশিষ্ট্য লেখার সময় রচয়িতাদের মধ্যে কাজ করে। এর থেকে রলাঁ বার্থ যেমন বেরনোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখায় জটিলতার ক্ষেত্রগুলি আমরা আগের অংশে দেখলাম। বাংলা সাহিত্যে মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনকেও সত্যের দায়ের কথা ভাবতেই হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের লেখায় আত্ম ও স্থানিক প্রতিকৃতি

আগের অধ্যায়ে প্রশ্ন ছিল কার 'আত্ম' কথা পড়ছি আমরা? এই অধ্যায়ের চিন্তন হল যার আত্মকথা লিখিত হয়েছে তাঁর অবস্থান কোথায়? অর্থাৎ আগের অধ্যায়ের জিজ্ঞাসাগুলি ছিল একেবারেই মানবকেন্দ্রিক/ anthropocentric; আর এই অধ্যায়ের জিজ্ঞাসাগুলি পরিবেশকেন্দ্রিক/ ecological। প্রকৃতির বিস্তারের সঙ্গে সহাবস্থানের বোধ আমাদের সত্তার গভীরে লিপ্ত, যার প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক লেখকের লেখনীতেই।

চার্লস বার্গম্যান তাঁর "'The Curious Peach': Nature and the Language of Desire" নামক লেখায় বলেন মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বা প্রকৃতি থেকে পলায়ন। তবু প্রকৃতির মাঝে নিজের অবস্থান আমরা নিত্য নতুন ভাবে অনুভব করি। বার্গম্যান এই অনুভবকে ব্যক্ত করেন, "I have come increasingly to venture into nature searching for . . . new intensities and new relationships. They derive from and lead to moments of self-discovery and self-transformation. I have felt such moments in nature, in which I have suddenly found that nature lifts me out of myself somehow, above the fragmented wilderness of my desire, into glimpses, not just of a new nature, but of a new

self in nature"[62]. এখানে এই 'a new self in nature' অভিব্যক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির মধ্যে 'আত্ম'কে আবিষ্কার ও 'আত্ম'র রূপান্তর একটা নতুন সত্তার জন্ম দেয়, এই নতুন সত্তার উৎপত্তি অবশ্যই প্রকৃতির মধ্যে। Peter F. Perreten-এর 'Eco-Autobiography: Portrait of Place/Self-Portrait' ও Melanie Pryor-এর 'Eco-Autobiography: Writing Self through Place' নামক লেখা দুটিতে দুজন লেখকই বলেছেন যে আত্ম-লিখন ও প্রকৃতির লিখন একসাথে পাওয়া গেলে এবং প্রকৃতির মধ্যে যদি 'একটা নতুন সত্তার জন্ম' হয় তাহলে সেই আত্মজীবনীকে ইকো-অটোবায়োগ্রাফি বলা যাবে।

আমাদের আলোচ্য মনীন্দ্র গুপ্তের *অক্ষয় মালবেরি* ও পরিতোষ সেনের *জিন্দাবাহার* টেক্সট দুটিতে কথক ও তাঁদের চারিপাশের প্রকৃতি পরিবেশের লিখিত ও রৈখিক বর্ণনা আমাদের অনুসন্ধিৎসু করে যে সাহিত্যের মধ্যে প্রকৃতি নির্মাণে বা পরিবেশ তৈরি করতে লেখক কোন কোন মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়েছেন? কিভাবে এঁদের সাহিত্যের ভাষাকাঠামোয় প্রকৃতি ধরা পড়েছে এবং এঁদের সত্তা প্রকৃতির মধ্যে নতুন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে কিনা? টেক্সটদুটিতে ইকো-অটোবায়োগ্রাফির বৈশিষ্ট্যগুলি আছে কিনা? এই অনুসন্ধানগুলি আমরা করবো এই অধ্যায়ে। দুটো টেক্সটই কথকদের নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে শৈশব থেকে কৈশোরের সম্পর্কের স্মৃতি/ নথি। দুটিই আত্ম-প্রতিকৃতির সঙ্গে স্থানিক-প্রতিকৃতির মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক। যদিওবা এঁনারা যে পাতার পর পাতা কেবল পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়েই বলে গেছেন

---

[62] Charles Bergman, "The Curious Peach : Nature and the Language of Desire", *Green Culture: Environmental Rhetoric in Contemporary America,* eds. Carl G. Herndl and Stuart C. Brown, (Maison: U of Wisconsin, 1996), 281-303.

এমনটি নয়, কিন্তু লেখার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবেশ ও প্রকৃতি চেতনা (যদিওবা দুজনের লেখার স্বর ভিন্ন) – সেই অংশগুলিই আলোচনায় আনা হবে এখানে।

৪.১ অক্ষয় মালবেরি

*অক্ষয় মালবেরি*র নামকরণের মধ্যেই আছে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এক চেতনা। মালবেরি গাছের চারিদিকে তীব্র ঘুরতে ঘুরতে লেখকের নিজেকে 'মানুষ নয় প্রাণী বলে মনে হয়'[63]। প্রাণীকুলের একজন হয়ে থাকাকে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। মালবেরি গাছের আগে 'অক্ষয়' বিশেষণটি রাখাও তাৎপর্যময় – তা চিররহস্য। অক্ষয় মালবেরি হল এক কল্পগাছ, তা বাস্তবে পাওয়া না গেলেও কল্পনায় ছুঁতে পারা যায়। কেন অক্ষয় মালবেরি এর উত্তর মনীন্দ্র গুপ্ত নিজেই দিয়েছেন 'আত্মজীবনী লেখার সংকট' প্রবন্ধে, "আর মালবেরি হল ছেলেবেলাকার আনন্দের গাছ, যাকে ঘিরে বাচ্চারা হাত ধরাধরি করে নাচে- Here we go round the mulberry bush, mulberry bush, mulberry bush, in a cold and frosty morning… । এই ছবিটা আমার মনে রয়ে গেছে। শুধু আমি একা নই, আপনারাও বয়সহারা চিরদিনের শিশু। অক্ষয় মালবেরিকে ঘিরে আপনাদের হাত ধরে, আমার বন্ধু স্বজনদের হাত ধরে আমি নেচে চলেছি, আজীবন। চারিদিকে শীত, কুয়াশা, আর ভারতীয় সূর্যের উজ্জ্বল আলো।"[64] 'মালবেরি বুশ' গানটির মধ্যে যে সারল্য আছে গাছকে ঘিরে হাতে হাত ধরে শিশুদের নাচার মধ্যে, তা লেখকের কল্পনায় 'অক্ষয়'।

---

[63] মনীন্দ্র গুপ্ত, *অক্ষয় মালবেরি,* (অবভাস, ২০১১), ১১.

[64] তদেব, ১০.

এখানেই ইঙ্গিত আছে যে আত্মকথা হলেও তা শুধু 'আত্ম' নয়, আত্ম বহির্ভূত জগৎ-কেও তিনি বিলীয়মান হয়ে যেতে দিতে চান না।

লেখাতে বারবার করে উঠে আসে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিথোজীবী সম্পর্ক। 'আমাদের ভাঁড়ার' অংশে লেখক বলেছেন গ্রামের জীবনে বন-জঙ্গল, পুকুরের থেকে খাবার উপকরণ সংগ্রহ ছিল প্রতিদিনকার ঘটনা। এছাড়া শিশুদের ছিল বনে, মাঠে, বাগানে, ভিটের এদিকে সেদিকে নিজেদের ভাণ্ডার। বাড়ির বড়রা দুপুরে ঘুমালে শিশুরা বেতবনে গিয়ে খুঁজে খুঁজে সাদা থোপা থোপা বেতফল পেড়ে খোসা ছাড়িয়ে 'সেই গভীর চোখের তারার মতো ফল' তেল, হলুদ, নুন মাখিয়ে নারকেলের মালার মধ্যে বন্ধ করে ঝাঁকিয়ে তার আস্বাদ করত এবং লেখকের ভাষায় সেই স্বাদ ছিল অনির্বচনীয়, যা খেয়ে তাদের 'দেহমনসত্তা সুখে ভরে যেত'। তাদের বড়পুকুরের ওপারে শ্মশানের গা ঘেঁষে থাকা প্রাচীন কাঁটাবোহরের গাছ থেকে ছোটো ছোটো বোহর ফল পেড়ে তারা সকলে খেত। কাঁটায় হাত-পা ছড়ে যেত, কিন্তু এর মধ্যেই ছিল আনন্দ। বোহর গাছের পাশে ছিল প্রকাণ্ড গাব গাছ, যেটির ঘোর কালো কাণ্ড, অঘোর কালো শাখাপ্রশাখা ও ঘন গাঢ় পাতায় গাছটির মাথার ভেতর অন্ধকার করে থাকত। লেখক পাকা গাবের লোভে গাছে উঠতেন কিন্তু গাছের পাতার থমথমে অন্ধকারে ভয় করত তাঁর। প্রকৃতির মধ্যে শুধু সৌন্দর্য ও রোম্যান্টিকতা নয়, ভয় ও উদ্বেগও কাজ করে মানুষের মনে। তিনি বলেছেন, "গাব গাছের মাথার মধ্যে এক নিস্তব্ধ ব্যক্তিত্ব- অন্য জগৎ। আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে আসতাম।"[65] বন-জঙ্গলের নিজস্ব ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কেটেছিল ওনার ছোটবেলা। প্রকৃতির যে নিজস্ব সত্তা আছে তা তিনি বারে বারে জানিয়ে দিয়েছেন

---

[65] তদেব, ২৪.

পাঠককে। তাঁদের পশ্চিম পুকুরের পারে বাঁশঝাড়ের কাছে ছিল জামরুল গাছ। বর্ষায় বৃষ্টির জল পেয়ে জামরুলগুলো টোবাটোবা হয়ে থাকত। সেই গাছে ছিল লাল পিঁপড়ের বাসা – "জামরুলপল্লবের পাতা সূক্ষ্ম ঊর্ণায় জড়িয়ে জড়িয়ে তারা দশ-বারোখানা ঝুলন্ত পিঁপড়ে-গ্রাম তৈরি করেছে। সারা দিন গাছটা জুড়ে তাদের ব্যস্ত যাতায়াত যেন হাজার হাজার সান্ত্রী রাজত্ব পাহারা দিচ্ছে। ওখানে পা দেয় কার সাধ্যি!"[66] সেখানেও লেখক চটের বস্তা গায়ে জড়িয়ে দ্রুত উঠে পড়তেন গাছে। তাও কয়েকটা পিঁপড়ে তাঁর মাংসে দাঁত বসাত এবং লেখক তাদের গায়ে ডোলেই মেরে ফেলতেন তক্ষুনি। জামরুল গাছের পাশেই ছিল গোলাপজাম গাছ – "তারাঝুমকোর মতো তার সাদা ফুল পাতাপল্লবের ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে অপরূপ লাগত। গোলাপজাম পাকলে ফলের মধ্যে তার বিচিটি আলগা হয়ে ঠনঠন করে।"[67] এছাড়া মটরশুঁটির লোভ এড়াতে না পেরে তারা বনে ঢুকত। কালবৈশাখীর সময় আম কুড়িয়ে খাওয়া ছিল এক আনন্দ। এর সাথে যুক্ত ছবিটি নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি যে ছবির শিশুটির গায়ে কোনো পোশাক নেই, প্রকৃতির বুকে নগ্নতাই যেন তার পোশাক। নানারকম বুনো ফল, মধু তো ছিলই; সারাবছর বন-জঙ্গলে, বাগানে তাঁরা নানারকম পরীক্ষাকার্য চালাতেন। লেখকের বর্ণনাতেই বোঝা যায় যে কি নিখাদ আনন্দ ও উৎসাহ ছিল এসবের মধ্যে। নিজেকে প্রাণীর মতো মনে হওয়া একরকম যথার্থই। অন্য সব প্রাণীর মতোই তাঁরাও প্রকৃতির সম্পদ মন ভরে উপভোগ করত। কোথাও কোনো কলুষতা নেই।

---

[66] তদেব, ২৪.

[67] তদেব, ২৪.

‘ধান চাল মাছ’ অংশে লেখক বর্ণনা করেছেন তাঁর সুরাকাকার বাড়ি যেতে বনপথে একটা বিশেষ অপরূপ জায়গা পড়ত এবং তিনি ঢেঁকিঘর থেকে পায়ে পায়ে সেই মায়াবি জায়গাটিতে চলে যেতেন। লেখককে যে সৌন্দর্য টানত তা ওনার নিজের কথাতেই শোনা যাক – “আমি লক্ষ করেছিলাম, ঐ জায়গাটুকুর মাটিই অন্য রকম উজ্জ্বল। তার নীরবতা ও ছায়া বড় কল্পনাপ্রবণ। সাধুরা যেখানে বাস করেন সেখানে যেমন শক্তি জমে তেমনি যে জায়গাটাকে মানুষ নিজের সম্পত্তি বলে মনে করে না সেখানে ধীরে ধীরে সৌন্দর্য অবতরণ করে।”[68] এখানেই চলে আসে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ-বিয়োগের ভাবনা। মানব জগত নিজের স্থান, অধিকার ইত্যাদি নিয়ে বড় বেশি করে সচেতন। মানব-নিরপেক্ষ জগতের বৈচিত্র্য তাই ম্লান হয়ে আসে। ফলত পরিবেশের যেই অংশ মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত সেখানেই রহস্য, কল্পনা, সৌন্দর্যের বাসা সৃষ্টি হয়।

‘এজমালি বাড়ি ও জ্ঞাতিবর্গ’ অংশে লেখক তাঁর সোনাদাদুর কথা বলেছেন যিনি শরতে আসতেন ও নবান্ন পার করে চলে যেতেন ও তিনি ছিলেন আনন্দময় পুরুষ। লেখক বলেছেন তাঁর চিলের পাখার মতো গায়ের রঙ, রক্তিম চোখ ও লম্বা মেদহীন শরীর দেখে লেখকের রামায়ণের সম্পাতি পাখির কথা মনে পড়ত। কিন্তু তিনি পাখি নন, মানুষ। এই যে মনুষ্যেতর প্রাণীর কল্পনা এটাই তাঁকে বৃহত্তর জীবজগতের অঙ্গে পরিণত করে।

মনীন্দ্র গুপ্তের লেখায় দেখতে পাই একজন মানুষের গভীরভাবে অনুভবের সক্ষমতা। তাঁর পঞ্চইন্দ্রিয় ও মনন সবসময় সজাগ। ‘মুনশিবাড়ি’ অংশে যেখানে গেলে লেখকের একরকম আশঙ্কাভরা

---

[68] তদেব,২৯.

অনুভূতি হত সেখানকার বর্ণনা – "প্রত্যেক ফুলের পাপড়ির কেন্দ্রে একটা সূক্ষ্ম ফুটো আছে, সেই ফুটো গিয়ে শেষ হয়েছে বোঁটার প্রান্তে। ঐ পথটুকু জাদুপথ। কেউ যদি অতি সূক্ষ্ম হয়ে ছুঁচের মতো ঐ পথের এক মুখ দিয়ে ঢুকে অন্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে তবে সে পৌঁছবে এক অন্য রাজ্যে। শিউলিফুলের ফুটো দিয়ে বেরুলে পাওয়া যাবে সাদা মেঘের দেশ। লাল সন্ধ্যামণির ফুটোর ওপারে আছে খুব সুন্দরী, আবছায়ায় চলাফেরা করা মেয়েদের দেশ। জ্যোৎস্নায় ফোটা হাসনুহানা ফুলের সূক্ষ্ম পথটুকু পেরুলেই ঝাড়লণ্ঠন নিবে আসা এক চাঁদনী জলসার দেশ। আর গ্রীষ্মের তাপে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাওয়া স্বর্ণচাঁপার ফুটো দিয়ে বেরুলেই মুনশিবাড়ি।"[69] পড়ে বোঝাই যায় লেখকের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। পার্থিবের মধ্যে থেকেও প্রাণ যেন অপার্থিবের জগতে চলে যেতে চায়। জায়গাটা লোকালয়ের থেকে দূরে। তাই সৌন্দর্য দৃষ্টির বৃত্তে কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও উপস্থিত।

'কার্তিককাকার বউ' অংশের বর্ণনা অত্যন্ত তাৎপর্যময়। বিয়ের মাসখানেক পর কার্তিককাকা কলকাতায় চলে গেলে লেখক লক্ষ করতেন কাকার বউয়ের মুখে ক্লিষ্টতার ছাপ, সারা গায়ে খড়ি ওঠা রুক্ষতা। সে গাছের আড়ালে গিয়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে ঊরু চুলকাতো আর বারবার প্রস্রাব করতে বসত, তার মুখ 'দিকভ্রষ্ট কাতর প্রাণীর'। লেখক বলেন হয়তো কাকিমা নিজেও তখনও বোঝেনি যে তার সিফিলিস হয়েছে স্বামীর দ্বারা। কিন্তু অদ্ভুত কথা লেখকের কাকিমা ক্রমশই যেন বনের গভীরে ঢুকে যেতে চাইত। বনের ঠাণ্ডা, ছায়াঘেরা স্বভাব যেন তখন তার আশ্রয়।

---

[69] তদেব, ৬০.

আগেই বলেছি মনীন্দ্র গুপ্তের লেখার মধ্যেও বারবার করে ছবি চলে আসে। 'নৌকাযাত্রা মাঝি' অংশে একদিন ভাটার সময় দুজন মাঝি লগি ঠেলতে না পেরে নৌকায় লম্বা দড়ি বেঁধে গুণ টানতে শুরু করে এবং তখন সূর্যাস্ত হচ্ছিল। লেখক দেখেছিলেন খালের খাড়া উঁচু পাড়ের গা ঘেঁষে শুধু আকাশ, সেখানে মেঘ ফেটে যেন গভীর আগুন ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর মনে একটি দার্শনিক প্রশ্নের উদয় হয় – "মানুষ কোথায় যায়?"[70] এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মনে যেই ছবিটা ভেসে উঠত তা হল – "লাল মেঘের মধ্যে দুজন মাঝি গুণ টেনে চলেছে"। একটা অত্যন্ত প্রতীকী ছবি। মাঝি জীবনের দ্যোতক। এখানে তিনি ব্যক্তি থেকে 'মানুষ'এর জীবনের দার্শনিক উপলব্ধি ও জীবনের বৃহত্তর প্রশ্নের কাছে পৌঁছেছেন। প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে তিনি এই দার্শনিক ছবিটি আহরণ করেন।

'তার পর' অংশে লেখক উল্লেখ করেন দাদু ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর তাঁর জীবনে প্রবেশ করে অনিশ্চয়তা ও যন্ত্রণা। এই অংশের সঙ্গে যেই ছবিটি সংযুক্ত আছে তাতে দেখা যায় লেখক রেইন ট্রি গাছের তলায় শুয়ে আছেন। ছবিটি এমন ভাবে আঁকা যেন দেখে মনে হচ্ছে ছোটো ছেলেটি গাছের গুঁড়ির পাশে নয় গাছের ভেতরে গাছের অংশ হয়ে শুয়ে আছে। তিনি লিখেছেন, "জলের স্নেহে ভাসা শৈবাল যেমন ভাটার টানে টানে উপড়ে যায় তেমনি জন্ম থেকে গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আমার আট বছরের মূল এইবার কষ্টে কষ্টে ছিঁড়ে যেতে লাগল, কিংবা এমনও হতে পারে, আমি বড় হচ্ছিলাম, এই জীবনের ধূসর শুকনো বাতাস বা গ্রামের বিষাদাচ্ছন্ন কুহেলিকায় ক্লান্ত হয়ে আমি অন্য কোথাও উড়ে যেতে চাইছিলাম।"[71]

---

[70] তদেব, ৬৫.

[71] তদেব, ৭৭.

লেখকের জীবনের মূল কষ্টে কষ্টে ছিঁড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু রেইন ট্রি গাছটির মূল সেখানেই মাটির গভীরে। ওখান থেকে উপড়ে ফেললে গাছটি আর বাঁচবে না। অথচ লেখককে নিজের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও এখানেই গাছের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের একটি তুলনা এসে পড়েছে।

তৃতীয় পর্বে 'শটিবন ও ম্যালেরিয়া' নামক অংশে লেখক বলেছেন যে যদি তিনি কোনো জনহীন বনের মধ্যে নিজেকে পুঁতে ফেলেন তাহলে আর কোনো ঝঞ্ঝাট থাকে না, অথচ তিনি বন্য লিলির মতো জ্যান্ত থাকবেন। এই যে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে রূপান্তরিত করে ফেলবার ইচ্ছা, তা আমাদের ভাবায়। মনীন্দ্র গুপ্তের লেখায় মানব জগত ও মানব-নিরপেক্ষ জগতের আন্তঃসম্পর্ক বারবার করে এসেছে। প্রকৃতির মধ্যে প্রশ্রয় পাওয়া জীবন ইতিহাস আমরা পাঠ করি। লক্ষ করলে বোঝা যায় কত আপাত তুচ্ছ লেখকের অভিজ্ঞতা ও কল্পনায় অভিজাত মূল্য পেয়েছে। মানুষটির ভেতরে যেন সতন্ত্র চিহ্নিত অন্য একটি মানুষও আছে যে প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছে এবং তার মধ্যেই কোথাও মদির স্বপ্নের চোরাস্রোতে বাঁচতে চাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। এটাই প্রকৃতির মধ্যে একটি সত্তার অবস্থিতি, যা লেখকের ছোটবেলার জীবন থেকে উপহারের মতো পাওয়া। সুতরাং *অক্ষয় মালবেরি*কে আমরা বলতেই পারি স্থান কেন্দ্রিক প্রকৃতি ভিত্তিক সাহিত্য। এর মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে একপ্রকার নান্দনিক ঘনিষ্ঠতা আমরা দেখতে পাই। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, কল্পনামদিরতা দিয়ে তাকে রোম্যান্টিক করে তোলার দৃষ্টান্ত যেভাবে পাওয়া গেছে তাতে মনীন্দ্র গুপ্তের আত্মজীবনীটিকে Peter F. Perreten ও Melanie Pryor-এর নিবন্ধ দুটিতে

ইকো-অটোবায়োগ্রাফির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেগুলি মাথায় রেখে ইকো-অটোবায়োগ্রাফি বা পরিবেশ প্রধান আত্মজীবনী বলা যায়।

৪.২ জিন্দাবাহার

চারিপাশের দৃশ্য আমাদের মনস্তত্ত্বকে চালিত করে। সমাজ-সংস্কৃতির বৃদ্ধি হলেও পরিবেষ্টিত পরিবেশের নিজস্ব দাবী থেকে যায়; প্রথাবিরোধী ভূদৃশ্যের বিশেষত্ব ধরা পড়ে। ফলত ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে তাঁর পরিবেশের সম্পর্ক চলে আসে স্বাভাবিকভাবেই। পরিতোষ সেনের আত্মজীবনীমূলক লেখা *জিন্দাবাহার*এ প্রথমেই আছে খিটখিটে মেজাজের দর্জি হাফিজ মিঞার কথা। লেখক বলেছেন দর্জিগিরিই হাফিজ মিঞার মুখ্য পেশা হলেও তাঁর প্রাণমন পড়ে থাকত তাঁর দোকানের ছাদে রাখা গেরোবাজ পায়রাগুলোর ওপর। পায়রা ওড়ানোর ইচ্ছে তাঁর নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। ভোরে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ছাদে চলে যেতেন এবং তাঁর সমস্ত অসুস্থতা, জড়তা, অবসাদ দূরে চলে যেত সেইসময়। তাঁকে দেখেই পায়রাগুলি আনন্দে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইত। মুঠো মুঠো ধান ছড়িয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিলে বাঁধভাঙা ভাবে পায়রাগুলো দানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। মিঞা তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিত। লেখক সেই মমতাভরা দৃশ্যকে বলেন, "আঃ কী মর্মস্পর্শী সে দৃশ্য!" কিন্তু এরপরেই পরিতোষ সেন লিখেছেন যে দানা খাওয়া শেষ হলেই নিশানের মতো লাল কাপড় ডগায় বাঁধা একটা মুলি বাঁশের সাহায্যে পায়রাগুলোকে আকাশে উড়িয়ে দিতেন মিঞা। লেখক বলেন, "পক্ষিজগতে এমন-কিছু কি আর আছে যার ডানাতে বে-লাগাম ঘোড়ার মতো প্রাণের উদ্দাম উচ্ছলতার এমন আশ্চর্য বিকাশ দেখা যায়! যে ডানার প্রত্যেকটি

পালক বিদ্যুতে ভরপুর এবং বিদ্যুতের মতোই ত্বরিত যার গতি! ... পাখিগুলো প্রথমে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে, সোজা লাইন কেটে হাউইবাজির মতো শূন্যে ওঠে। পরমুহূর্তে তেমনি সোজা লাইনে নিচের দিকে গোত্তা মারে। ... মিঞা একহাতে মুলি বাঁশটি উঁচিয়ে ঘোরাতে থাকে, অন্য হাতে সাঁড়াশির মতো নীচের ঠোঁট চেপে ধরে, সরু মোটা ছোটো-বড় শিস্ দিতে থাকে। ... চল্লিশ-পঞ্চাশটি খানদানি গেরোবাজ পায়রা যখন একই সঙ্গে, একই ছন্দে, চক্রাকারে ডিগবাজির পর ডিগবাজি খেতে থাকে তখন মনে হয় যেন আকাশে পাখিদের ব্যালে-নৃত্য দেখছি..."[72]। এই যে পায়রাগুলোর লাইন ধরে 'হাউইবাজির' মতো শূন্যে ওড়া, চক্রাকারে ছন্দ মেনে ডিগবাজি খাওয়া এবং তা দেখে 'ব্যালে-নৃত্য' মনে হওয়া – এই বর্ণনা অত্যন্ত শহুরে এবং পায়রাগুলো প্রচণ্ডভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এই বর্ণনা পড়তে ভীষণই চিত্তাকর্ষক। পায়রাগুলির কলাকৌশল নান্দনিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, কিন্তু তাদের সংগঠনে সহজ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রবণতা কমে আসছে, পাখির স্বাধীনতার আস্বাদটা কমে যাচ্ছে। হাফিজ মিঞার পাখিদের এই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে উড়তে শেখানোর পদ্ধতিকে লেখক তুলনা করেছেন 'সামরিক' পদ্ধতি হিসেবে। এটি একটি 'চারুকলা' যেন। এই প্রক্রিয়াকে মিঞা প্রতিযোগিতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা শহরের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত পায়রার রেস হয় এবং তাতে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ঝাঁক পায়রাকে প্রতিযোগিতায় নামানো হয়। মিঞা তাঁর পছন্দের পায়রাগুলোকে নিয়ে বস্তুত খেলায় মেতে ছিলেন। অত্যন্ত সৌষ্ঠবপূর্ণ এই ক্রিয়া।

পরিতোষ সেনের লেখায় উল্লেখিত ডেন্টিস্ট আখতার মিঞার শখ হয়েছিল বুড়িগঙ্গার চরে বেলে হাঁস, ডাহুক, পানকৌড়ি ইত্যাদি যাবতীয় খাবার পাখি শিকার করা। শিকার তাঁকে নেশার মতো পেয়ে

---

[72] পরিতোষ সেন, *জিন্দাবাহার,* (প্যাপিরাস, ১৯৭৯), ৭.

বসেছিল। এটি তাঁর মতে হিংসাত্মক কার্য ছিল না, কারণ খাবার উদ্দেশ্যে প্রাণীহত্যা তাঁর কাছে ন্যায্য ছিল। একবার তিনি লেখককে বাঘ শিকারের গল্প বলেছিলেন। খুবই সরস সেই গল্প। কিন্তু বক্তব্য বিষয় হল সমস্ত বীরত্ব পশুপাখি শিকারের সূত্র ধরে। পশুপাখির ওপর আধিপত্য কায়েম করে। শিকার মানুষের একটি আদিমতম ক্রিয়া এবং এই ক্রিয়ার সঙ্গে বীরত্বের যোগ প্রাচীন যুগ থেকেই। তারই একটি উদাহরণ আমরা পাই টেক্সটটি থেকে। এখানে কোনো পরিবেশ সচেতনতার বোধ কাজ করেনি।

'আগুন' অংশের ছবিটি নিয়ে আগেই কথা বলেছি। এই আগুন হল লেখকের পিতৃদেব প্রসন্নকুমার সেনের চিতার আগুন। লেখকের চেতনায় আগুনের ছবিটি ধরা পড়েছে এইভাবে – "আগুন ঢেউ-খেলে-খেলে শুঁয়োপোকার মতো আস্তে-আস্তে চিতার ওপরের দিকে উঠছে। সামনে আগুনের জাফরানী লাল, আর তার পেছনে পুকুরের জলের ঠাণ্ডা সবুজ। বাঃ! এ তো ভারী চমৎকার। এত সুন্দর রঙের খেলা এর আগে তো তেমন দেখিনি। এই পটভূমিকায় সমবেত লোকেদের ছায়ার মতো কালো কৃশ দেহগুলো, আর তাদের কোমরে বাঁধা লাল গামছা – সব মিলে চমৎকার একটি ছবির মতো দেখাচ্ছে।"[73] লেখক এই আগুনকে দেখেছেন শিল্পীর চোখ দিয়ে, কল্পনায় মুগ্ধতার চোখ দিয়ে। এই দেখার মধ্যে আছে নির্লিপ্ততা; যার সৌন্দর্য ও বিস্ময় মৃত্যুর শোককে ছাপিয়ে গেছে। মৃত্যুর পর দাহকার্যে পঞ্চভূতে বিলীন হয় মানব শরীর। এই প্রক্রিয়া প্রকৃতিরই অন্তর্গত। লেখকের চোখে আগুনের নান্দনিক ক্ষিপ্রতা, তেজ, সর্বগ্রাসী প্রবণতা একইসাথে ভয় ও সৌন্দর্য হিসেবে ধরা পড়েছে – যা তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেননি। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বোধ তাঁকে অন্যদিকে প্রকৃতির সৃষ্টির বৃহত্তর রহস্যের সামনে এনে ফেলেছে।

---

[73] তদেব, ৭৭.

ঢাকা জেলায় নিজেদের গ্রামের কথা মনে হলে লেখকের চোখে একটা বিমূর্ত ছবি ভেসে উঠত। নানারকমের সবুজ দিয়ে সাজানো ছিল তাঁদের গ্রাম। লেখক এই সবুজের তুলনা করেছেন মার্কিনী আর্টিস্ট মার্ক রথকোর আঁকা ছবির সঙ্গে। এতোটাই সবুজের ঐকতান। বাড়ির ত্রিসীমানার মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, জারুল, জামরুল, তেঁতুল, গাব, কদম, ডুমুর, চালতা, কনকচাঁপা, ডালিম, নারকেল ইত্যাদি সবুজ গাছের ছড়াছড়ির মধ্যে সবকিছু ছাপিয়ে ছিল তাঁদের পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটা বনস্পতি জাতের অর্জুন গাছ। "তার আশ্চর্য গড়ন আর ঋজু কাঠামো দেখে মনে হয় কোনো ওস্তাদ ইন্‌জিনিয়ারের হাতের সৃষ্টি। বাইরের এবং ভেতরকার খাড়া ও সমান্তরাল রেখার কি নিখুঁত সমন্বয়। তেমনই নিখুঁত তার ব্যালেন্স। সমস্ত গাছটাতেই, আপাদমস্তক ওজনের এমনই চমৎকার বিভাজন যে ম্যানহাটানের একশো আশি তলার বাড়ির মতো যত ইচ্ছে আকাশের দিকে বাড়িয়ে যাও।"[74] এই বর্ণনায় বোঝাই যায় লেখকের মনস্তত্ত্বের মধ্যেকার শহরকেন্দ্রিকতা। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের বানানো কাজের ছবি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন। শহরকেন্দ্রিকতার সঙ্গে প্রকৃতি জড়িয়ে থাকে ঠিকই; কিন্তু সেরকমই একপ্রকার নান্দনিকতা এসেছে লেখকের শহুরে বর্ণনায়। আর গাছটি ব্যকরনগত ভাবেও খুবই যথাযথ। লেখক আরও বলেছেন যে গাছের কাঠামো, উত্থান-পতন, ডালপালায় ছন্দের খেলা, দাঁড়াবার ভঙ্গি, ত্রিমাত্রিকতা যেন রেনেসাঁ যুগের মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর 'ডেভিড'। তবে অর্জুন গাছটির বর্ণনা যতই শহুরে হোক না কেন, লেখকের পরিবেশ চেতনার বোধও আমরা পাই এই অংশেই যখন তিনি বলেন যে অর্জুন গাছে একদিন দুটি হনুমান কোথা থেকে এসে গাছটির অজস্র ডালপালার মধ্যে লাফাচ্ছিল, পাখিদের বাসা টান মেরে ছুঁড়ে ফেলেছিল। সে এক

[74] তদেব, ৯৫.

তাণ্ডব। পরক্ষনেই প্রায় হাজার খানেক পাখি হনুমান দুটোকে আক্রমন করে। বানররা পালালে দেখা যায় নীচে অনেক পাখি মরে পড়ে আছে। লেখকের বয়ানে পাই, "বানরদের মধ্যে শুধু-শুধু ধংস করার একটা প্রবৃত্তি এর আগেও লক্ষ করেছি। কিন্তু সেই তুলনায় মানুষের মধ্যে তো এই পশুপ্রবৃত্তি হাজার গুণে বেশি। নিছক আনন্দ পাবার দুর্বার লোভেই হোক, কিম্বা ব্যাবসার লালচেই হোক, এ-দুয়ের ফলে পৃথিবীর বুকে আজ একশো কুড়ি রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী, আর দুশো পঁচিশ রকমের পাখি, মানুষের শিকার হয়ে একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। শোনা যায় আরো ছয়শো পঞ্চাশ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখিদের লোপ নাকি অনিবার্য।"[75] লেখক যে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন, তার এই মন্তব্যের চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি হতে পারে?

জিন্দাবাহার টেক্সটটিতে প্রকৃতি-পরিবেশকে দেখাটা আছে, কিন্তু গভীরভাবে সম্পৃক্ততা নেই। লেখকের বেড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। আমরা দেখলাম লেখকের সৌন্দর্য চেতনার অবলোকন প্রবৃত্তি শহুরে মানসিকতায় আচ্ছন্ন এবং অবশ্যই তাঁর দেখার নজর নিরপেক্ষ। সেকারণে পরিতোষ সেনের এই আত্মজীবনীমূলক লেখাটিতে পরিবেশ চেতনা থাকলেও, মুগ্ধতা ও উদ্বেগ থাকলেও একে ইকো-অটোবায়োগ্রাফি আখ্যায়িত করা যাচ্ছে না।

---

[75] তদেব, ১০৯.

উপসংহার

ভূমিকায় আমার কাজটির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলেছি। চারটি অধ্যায়ের শেষে এবারে উপসংহারে বলার বিষয় হল প্রথমত, মনীন্দ্র গুপ্তের *অক্ষয় মালবেরি* ও পরিতোষ সেনের *জিন্দাবাহার*'এ রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'র ধরণটার ছায়া আছে। আবার এনাদের লেখায় প্রকৃতি এসেছে খুব বড় করে। বিভূতিভূষণের দিনলিপির আকারে লেখা *স্মৃতির রেখা, তৃণাঙ্কুর* প্রভৃতির মধ্যে যেভাবে প্রকৃতি রয়েছে সেটার একটা ধরণ এগুলিতে রয়েছে। *পথের পাঁচালী, অপরাজিত* প্রভৃতির কথাও বলা যায়, কিন্তু সেগুলি মূলত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* যেমন আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। তাই ইচ্ছে করেই দিনলিপিগুলির উল্লেখ করেছি। এছাড়া রায় পরিবারের উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সত্যজিত রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সে,* বিনোদবিহারী প্রমুখদের লেখার সঙ্গে ছবি যুক্ত করার যে প্রবণতা তা মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের টেক্সটগুলিতে পাওয়া যায়।

আলোচনার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে *অক্ষয় মালবেরি*তে মনীন্দ্র গুপ্ত এবং *জিন্দাবাহার*'এ পরিতোষ সেনের লেখা ও রেখার মধ্যেকার সেতুটি একটি অনন্য কথোপকথন আমাদের উপহার দেয়, যা কিনা দুটি লেখাকেই সমৃদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে। মনীন্দ্র গুপ্তের ক্ষেত্রে সেই কথোপকথন খুবই রোম্যান্টিক যা তাঁর স্কেচ বা ডুড্‌ল সুলভ ইলাসট্রেশনকেও পাঠক মানসে একটি অনন্য নিসর্গ চিত্র রূপে উপস্থাপন করে। অপরক্ষেত্রে পরিতোষ সেনের অতি পরিশীলিত ইলাসট্রেশন পাঠক মানসে এক নিপুণ কৃতির জন্ম দেয়। দুই ক্ষেত্রেই বক্তব্য বিবরণমূলক; কিন্তু সূক্ষ্ম তফাতটি হল মনীন্দ্র গুপ্তের লেখা তাঁর রেখাকে সমৃদ্ধ করে

এবং পরিতোষ সেনের রৈখিক বিবরণ তাঁর লেখাকে শুধু সম্পৃক্ত করে। অতয়েব আমরা বলতেই পারি লেখা ইলাসট্রেশনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কথোপকথন তৈরি করছে।

তৃতীয়ত প্রত্যেকটি আত্মজীবনীমূলক লেখায় সত্যের প্রতি যে দায়টি থাকে সেই দায় প্রতিপাদ্য হচ্ছে কিনা সেটা ধরার জন্য আমাদের দেখতে হবে সময়ের নিরিখে ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে লেখকের একাত্ম হয়ে যাওয়ার চেষ্টা। মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের লেখায় এই একাত্ম হয়ে যাওয়ার চেষ্টা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এই টেক্সটের পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখা হোক কিংবা রেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট। মনীন্দ্র গুপ্তের ক্ষেত্রে এই পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে মনে ভাবতে বাধ্য করে লেখকের আত্মজগতের চাবিকাঠিটি। লেখকের লেখাই পাঠকের হাতে ধরিয়ে দেয় সেই চাবিকাঠি। একইসঙ্গে পরিতোষ সেনের ক্ষেত্রেও পাঠকের মনে হয় যে সে একটি চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। দুটি ক্ষেত্রেই উচ্চতর দৃশ্যের আড়ম্বর ও বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ যে যাত্রা সেটা সম্পূর্ণ হয় পাঠকের কল্পনাশক্তির প্রসারতার দ্বারা। এবং দুটি ক্ষেত্রেই এই যাত্রার পথটি অত্যন্ত মসৃণ। সেকারণে পাঠক লেখার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং লেখকের জীবনের সত্যি পাঠকের সত্যের দায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। এভাবেই আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে সত্যের দাবী লেখক ও পাঠক মানসে একভাবে কাজ করে চলে।

মানুষের জগত ও জীবজগত যেখানে সচেতন বা অসচেতনভাবে পৃথক হয়ে যায় সেখানেই হস্তক্ষেপ করে ইকোক্রিটিসিজম। কীভাবে মানুষের জগতে জীবজগত ‘অপর’, কীভাবে সমাজ ও প্রকৃতি আলাদা এই বিচ্ছিন্নতার দিকগুলি বোঝার সাথে সাথে এগুলির পারস্পরিক যোগাযোগও আলোচনায় এসে যায়। সুতরাং টেক্সটের ভেতরে যে কল্পিত তথা সক্রিয় ‘আত্ম’, পাঠ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা একটি নতুন

সত্তা হয়ে উঠতে পারে। এই বিশেষ অনুসন্ধানটি আত্মজীবনীর পাঠকে অন্যদিকে নিয়ে যায়। আত্মজীবনীতে যেমন স্থান ও স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আবেগ গুরুত্বপূর্ণ (যেমন- পরিতোষ সেনের *জিন্দাবাহার* টেক্সটে জিন্দাবাহার লেন কিংবা মনীন্দ্র গুপ্তের *অক্ষয় মালবেরি*তে তাঁর শৈশবের বরিশাল গ্রামের কথা); সেই স্থান কেন্দ্রিক বোধ ইকোক্রিটিসিজমের আলোচনাতেও মুখ্য। অর্থাৎ, আত্মজীবনীতে আত্ম-প্রতিকৃতি এবং সেইসঙ্গে স্থানিক প্রতিকৃতি একসাথে তৈরি হয়েছে আলোচ্য টেক্সট দুটিতে; সেকারণে উত্তর গঠনবাদ থেকে নিবিড় বাস্তবাদ/ 'deep ecology'র দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকে – যা আমি এই গবেষণায় অনুসরণ করেছি এবং 'আত্ম' ও 'প্রকৃতি' এই দুটি মনীন্দ্র গুপ্ত ও পরিতোষ সেনের লেখা ও সংযুক্ত ছবির মধ্য দিয়ে কীভাবে ওতপ্রোত হয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর কার্যকারণগুলো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে বলি এই গবেষণার থেকে আগামীতে কি কি কাজ হতে পারে। বাংলা সাহিত্যে যে অসংখ্য আত্মজীবনীর ধারা আছে তাই নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণার সম্ভবনা এই গবেষণা থেকে তৈরি হতে পারে। কবিতা, উপন্যাস, ছবি – এই মাধ্যমগুলির সাথে আত্মজীবনীর সম্পর্কের পর্যালোচনা এখান থেকে আসতে পারে। বাংলা সাহিত্যে ইলাসট্রেশনের ধারাবাহিক ইতিহাস এখনও প্রস্তুত নয়। সেটিও একটি মূল্যবান গবেষণার বিষয় হতে পারে। এই বিষয়গুলো নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া দরকার বলে মনে করি।

গ্রন্থপঞ্জি / Bibliography

ইংরেজি বই

Anderson, Linda. *Autobiography.* New York: Routlegde, 2001.

Bakhtin, Mikhail. *The Dialogic Imagination: Four Essays.* Translated by Caryl Emerson and M. Holquist. Austin: University of Texas Press, 1981.

Barthes, Roland. *Image Music Text.* Fontana Press, 1977.

—. *Roland Barthes by Roland Barthes.* Translated by Richard Howard. New York: Hill and Wang, 2010.

—. *Signs and Images.* Translated by Chris Turner. Seagull Books, 2016.

Bell, Michael Mayerfeld. *An Invitation to Environmental Sociology.* New Delhi: Sage, 2012.

Brown, Carl G. Herndl and Stuart C., ed. *Green Culture: Environmental Rhetoric in Contemporary America.* Maison: U of Wisconsin, 1996.

Colebrook, Claire. *Death of the PostHuman.* Open Humanities Press, 2014.

Dasgupta, Subha Chakraborty, ed. *Literary Studies in India : Genelogy.* Kolkata: Florence Offset Process Pvt. Limited, 2004.

Derrida, Jacques. *The Ear of the Other.* Edited by Christie McDonald. Translated by Peggy Kamuf. United States of America: Nebraska, 1988.

Derrida, Jacques. *Of Grammatology.* Translated by Gayatri Chakravorty Spivak. Delhi: The John Hopkins University Press, 1994.

Dodds, Joseph. *Psychoanalysis and Ecology at the Edge of Chaos : Complexity Theory, Deleuze | Guattari and Psychoanalysis for a Climate in Crisis.* New York: Routledge, 2011.

Foucault, Michel. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences.* London: Tavistock Press, 1970.

Freud, Sigmund. *An Autobiographical Study.* New York: Brentano, 2010.

Fromm, Cheryll Glotfelty and Harold, ed. *The Ecocriticism Reader.* Athens, Georgia: University of Georgia Press, 1996.

Garrard, Greg. *Ecocriticism.* Routledge, 2012.

Gillespie, Haun Saussy and Gerald, ed. *Intersections, Interferences, Interdisciplines Literature with Other Arts.* Germany: Oxford, 2014.

Harari, Yuval Noah. *Homo Dues A Brief History of Tomorrow.* Uk: Vintage, 2016.

—. *Sapiens A Brief History of Mankind.* London: Vintage Books, 2011.

Heidegger, Martin. *Being and Time.* Translated by John Macquarrie and Edward Robinson. New York: Harper Perennial Modern Thought, 2008.

Hipchen, Ricia Anne Chansky and Emily, ed. *The Routledge Auto/Biography Studies Reader.* New York: Routledge, 2016.

Huddart, David. *Postcolonial Theory and Autobiography.* London and New York: Routledge, 2008.

Huggan, Graham and Tiffin, Helen. *Postcolonial Ecocriticism Literature, Animals, Environment.* London and New York: Roultedge, 2010.

Jameson, Fredric. *Marxism and Form: 20th Century Dialectical Theories of Literature.* Princeton: Princeton University Press, 1971.

—. *The Political Unconsciousness: Narrative as a Socially Symbolic Act.* Ithaca: Cornell University Press, 1981.

Joyce, James. *A Portrait of the Artist as a Young Man.* New Delhi: Fingerprint Classics, 2017.

Nietzsche, Friedrich. *Ecce Homo.* UK: Penguin Classics, 2004.

Roy, Sumana. *How I Became a Tree.* India: Aleph, 2017.

Sarkar, Tanika. *Words to Win The Making of Amar Jiban: A Modern Autobiography.* New Delhi: Zuban, 2013.

Sen, Paritosh. *Fire and Other Images.* New Delhi: Tulika Books, 2004.

Sharma, Debashree Dattaray and Sarita, ed. *Ecocriticism and Environment Rethinking Literature and Culture.* Delhi: Primus Books, 2018.

Shormistha Panja, Shirshendu Chakrabarti and Christel R. Devadawson, ed. *Word, Image, Text.* New Delhi: Orient BlackSwan, 2009.

Straight, Nathan. *Autobiography, Ecology, and the Well-Placed Self: The Growth of Natual Biography in Contemporary American Life Writing.* New York: Peter Lang Publishing, 2011.

Trigg, Dorothee Legrand and Dylan, ed. *Unconsciousness between Phenomenology and Psychoanalysis.* Paris: Springer, 2017.

Tynjanov, Jurij. *Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views.* Cambridge: Mass: MIT Press, 1971.

Wordsworth, William. *William Wordsworth The Major Works.* London: Oxford University Press, 1984.

বাংলা বই

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতা.* কলকাতা: ত্রিবেণী প্রকাশনী, ১৯৮৫.

গুপ্ত, মনীন্দ্র. *অক্ষয় মালবেরি.* কলকাতা: অবভাস, ২০১১.

- *উপন্যাস সংগ্রহ.* কলকাতা: অবভাস, ২০১৮.

- *গদ্যসংগ্রহ ১.* কলকাতা: অবভাস, ২০১৩.

- *গদ্যসংগ্রহ ২.* কলকাতা: অবভাস, ২০১৬.

- *দ্রাক্ষাপুঞ্জ, শুঁড়ি ও মাতাল.* কলকাতা: অবভাস, ২০১০.

- *প্রেম, মৃত্যু কি নক্ষত্র.* কলকাতা: অবভাস, ২০০৫.

- *রং কাঁকর রামকিঙ্কর.* কলকাতা: অবভাস, ২০১৩.

চক্রবর্তী, কবিতা নন্দী. *বাংলা সাহিত্যে পরিবেশচেতনা রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ জীবনানন্দ.* কলকাতা: আশাদীপ, ২০১৭.

চৌধুরানী, সরলাদেবী. *জীবনের ঝরাপাতা.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *খাপছাড়া.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৯৭.

- *জীবনস্মৃতি.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০১৭.

- *রবীন্দ্র রচনাবলী* (১২৫-তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পঞ্চদশ খণ্ডে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ). কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৮৬-৮৯.

- *সে.* কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০০.

দাশ, শিশিরকুমার. *আত্মজীবনী: জীবনী ও রবীন্দ্রনাথ.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭.

দাশগুপ্ত, ধীমান. *কম্পোজিশন.* কলকাতা: অবনীন্দ্রনাথ বেরা বানীশিল্প, ২০০৫.

দাসী, রাসসুন্দরী. *আমার জীবন.* নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১১.

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী. *আলিবাবার গুপ্তভাণ্ডার.* কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৯.

ভট্টাচার্য, চিত্তপ্রসাদ. *দুঁহু প্রেম দোহা.* কলকাতা: শ্রীরানা সরকার শিল্পায়ন আর্টিস্টস্ সোসাইটি, ১৯৬৬.

ভট্টাচার্য, দেবীপদ. *বাংলা চরিত সাহিত্য.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২.

ভদ্র, গৌতম. *ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার.* কলকাতা: ছাতিম বুকস, ২০১১.

মণ্ডল, রবীন. *শিল্পভাবনা.* কলকাতা: অবনীন্দ্রনাথ বেরা বাণীশিল্প, ২০১৮.

মিত্র, অশোক. *ছবি কাকে বলে.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১.

মিত্র, অশোক. *ভারতের চিত্রকলা*(প্রথম খণ্ড). কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫.

মিত্র, হিরণ. *আঁকাআঁকি ও অন্যান্য.* কলকাতা: এস জে পারফেকশন প্রিন্টিং প্রা. লি., ২০০৭.

মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী. *চিত্রকর.* কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ২০০৭.

রায়, উপেন্দ্রকিশোর. *উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী.* কলকাতা: নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০০.

রায়, সুকুমার. *সুকুমার রচনা সমগ্র.* কলকাতা: নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০২.

শাস্ত্রী, শিবনাথ. *আত্মচরিত.* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩.

- *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ.* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৫৫.

সরকার, নিখিল (শ্রীপান্থ). *কেয়াবাৎ মেয়ে.* কলকাতা: আনন্দ, ২০১৬.

সরকার, সুব্রত. *কবিতা সংগ্রহ.* কলকাতা: রাবণ, ২০১৬.

সেন, পরিতোষ. *আবু সিম্বাল, পিকাসো ও অন্যান্য তীর্থ.* কলকাতা: আনন্দ, ২০১২.

- *জিন্দাবাহার.* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৭৯.

- *রং তুলির বাইরে.* কলকাতা: ভাষাবিন্যাস, ২০০৮.

পত্রপত্রিকা

উপাধ্যায়, অশোক (সম্পা). *"১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা".* প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা. জুন. ২০১৪.

রোদে ধান ছায়ায় পান (র‍্যাডের কথাকাগজ). সপ্তম সংখ্যা. অগ্রহায়ণ. ২০০৭.